বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিদ্যার বহুবিস্তীর্ণ ধারার সহিত শিক্ষিত-মনের যোগসাধন করিয়া দিবার জন্য ইংরেজিতে বহু গ্রন্থমালা রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় এ-রকম বই বেশি নাই যাহার সাহায্যে অনায়াসে কেহ জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের সহিত পরিচিত হইতে পারেন। শিক্ষাপদ্ধতির ত্রুটি, মানসিক সচেতনতার অভাব, বা অন্য যে-কোনো কারণেই হউক, আমরা অনেকেই স্বকীয় সংকীর্ণ শিক্ষার বাহিরের অধিকাংশ বিষয়ের সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত। বিশেষ, যাঁহারা কেবল বাংলা ভাষাই জানেন তাঁহাদের চিত্তানুশীলনের পথে বাধার অন্ত নাই; ইংরেজি ভাষায় অনধিকারী বলিয়া যুগশিক্ষার সহিত পরিচয়ের পথ তাঁহাদের নিকট রুদ্ধ।

যুগশিক্ষার সহিত সাধারণ-মনের যোগসাধন বর্তমান যুগের একটি প্রধান কর্তব্য। বাংলা সাহিত্যকেও এই কর্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হইলে চলিবে না। তাই এই দুর্যোগের মধ্যেও বিশ্বভারতী এই দায়িত্বগ্রহণে ব্রতী হইয়াছেন।

॥ ১৩৫২ ॥

৩৭. হিন্দু সংগীত : শ্রীপ্রমথ চৌধুরী ও শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরানী
৩৮. প্রাচীন ভারতের সংগীত-চিন্তা : শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল
৩৯. কীর্তন : শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র
৪০. বিশ্বের ইতিকথা : শ্রীসুশোভন দত্ত
৪১. ভারতীয় সাধনার ঐক্য : ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত
৪২. বাংলার সাধনা : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৪৩. বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ : ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়
৪৪. মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী : ডক্টর সুকুমার সেন
৪৫. নব্যবিজ্ঞানে অনির্দেশ্যবাদ : শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
৪৬. প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা : ডক্টর মনোমোহন ঘোষ
৪৭. সংস্কৃত সাহিত্যের কথা : শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী
৪৮. অভিব্যক্তি : শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অভিব্যক্তি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন

বিশ্বভারতী. ৬৷৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

চৈত্র ১৩৫২

মূল্য আট আনা

মুদ্রাকর শ্রীনগেন্দ্রনাথ হাজরা

বোস প্রেস, ৩০, ব্রজনাথ মিত্র লেন, কলিকাতা

-৭-৫৮.

ভূমিকা

জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে দুরকম ধারণা প্রচলিত। যা কিছু জড় ও জীব আমরা এখন পৃথিবীতে দেখতে পাই তা হয় আকস্মিকভাবে কোনো এক মাহেন্দ্রক্ষণে সৃষ্টি হয়েছিল নয় তো সামান্য কয়েকটি উপাদান থেকে পৃথিবীর বৈচিত্র্য ক্রমে ক্রমে গড়ে উঠেছে। বহুকাল ধরে লোকে প্রথমটাই বিশ্বাস করে এসেছে। মাত্র শ'খানেক বছর হল, এই বিশ্বাসে সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে মানুষের মনে। কয়েকজন বিজ্ঞানী এই সন্দেহ আমাদের মনে জাগিয়ে দিয়েছেন, তার মধ্যে ডারউইন্‌ই প্রধান।

তার গাছপালা জীবজন্তু নিয়ে জগৎটা আকস্মিকভাবে, বিশেষত দৈবশক্তির সাহায্যে, একেবারে প্রস্তুত হয়ে গেল মনে করার ভিতর বেশ একটু আরাম আছে। আমাদের বুদ্ধি বেশি খাটাতে হয় না, অনেকরকম কুটকচালে ভাবনা থেকে আমরা বেঁচে যাই। তাই এই অন্ধ বিশ্বাস সহজে ছাড়তে ইচ্ছে করে না। তার উপর ধর্মের দোহাই দিতে পারি। চিরকাল ধর্মযাজকরা আমাদের এই কথাই বিশ্বাস করতে বলে এসেছেন। 'ব্রহ্মার অবয়ব থেকে বিভিন্ন জীব জন্মেছে' বা 'ভগবানের এক ফুঁয়েতে সব সৃষ্টি হল' গোছের আজগুবি গল্প শিশুকাল থেকে শুনে শুনে আমাদের সৃষ্টিরহস্য সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য জানবার কৌতূহলই জাগে না। এ বিষয়ে আমাদের দেশে যেমন অন্যান্য দেশেও ঠিক তেমনই অজ্ঞতা ও অন্ধতা ছিল। তাই ইউরোপে বিজ্ঞান যখন সৃষ্টিতত্ত্বের অলৌকিক

রহস্য ত্যাগ করে যুক্তিতর্কের গণ্ডির মধ্যে তাকে এনে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগল তখন চারদিকে তুমুল বিবাদ বেধে গেল। লৌকিক ধর্মবিশ্বাস ও বিজ্ঞানের মধ্যে সেই থেকে বিরোধ চলে আসছে, এখনো তা সম্পূর্ণ মেটে নি।

চলতি বিশ্বাস অজ্ঞতার সহজপথ নিয়ে চলেছে চিরকাল, কিন্তু সব যুগেই সব দেশেতেই দেখা যায়, কয়েকজন মনীষী পুরুষ জীবজগতের আবির্ভাব কি করে হল তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করেছেন। বৈজ্ঞানিক গবেষণা শুরু হয়েছে হাল আমলেই, এক শতাব্দীর খুব বেশি পূর্বে নয়, কিন্তু মনে করলে চলবে না যে, বৈজ্ঞানিক মতবাদ সম্পূর্ণ খাপছাড়া নতুন একটা ব্যাপার; বহু তত্ত্বজ্ঞানীদের গত হাজার দু'হাজার বছরব্যাপী চিন্তাধারারই তা পরিণতি। ডারুউইন প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা তাঁদের পূর্ববর্তী মনীষীদের কাছে যথেষ্ট ঋণী। পুরাকালে তত্ত্বজ্ঞান ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোনো ভাগ ছিল না। সেইজন্য পুরাকালে যা কিছু বৈজ্ঞানিক তথ্য জানা ছিল তা আমাদের প্রাচীন তত্ত্বজ্ঞানী বা ঋষিদের কাছ থেকেই সংগ্রহ করতে হয়।

সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে ভারতবর্ষের প্রাচীনতম বেদ ও উপনিষদাদি গ্রন্থে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, সর্বপ্রথমে জল সৃষ্টি হয়েছিল,[১] তার থেকে সব কিছু সৃষ্টি হয়েছে। মনুর মতে সেই জলে একটি অণ্ড সৃষ্ট হয় এবং সেটি দ্বিধা বিভক্ত হলে আকাশ ও ভূমি উৎপন্ন হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদেও (৩।১৯) এইরূপ অণ্ডের কথা আছে এবং দ্বিধাবিভক্ত অণ্ড থেকে আকাশ ও ভূমির উৎপত্তির কথা আছে। ঐ উপনিষদের অন্যত্র (৬।২) আরও বিশদভাবে বর্ণিত আছে— ব্রহ্ম থেকে তেজ,

---

১ তুং মনু—১।৮, "অপ এব সসর্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ।" ১।১২ ইত্যাদি শ্লোকও দ্রষ্টব্য।

জল ও পৃথ্বী (অন্ন) এই তিন তত্ত্ব উৎপন্ন হয়েছিল। আবার তৈত্তিরীয় উপনিষদে (২।১) পাওয়া যায় যে, প্রথমে কেবল আত্মা ছিল, আত্মা থেকে আকাশ, আকাশ থেকে বায়ু, বায়ু থেকে অগ্নি, অগ্নি থেকে জল, জল থেকে পৃথিবী, পৃথিবী থেকে ওষধিসকল, ওষধি থেকে অন্ন ও অন্ন থেকে পুরুষ সৃষ্টি হয়। যে মৌলিক পদার্থগুলি থেকে প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছে সেই পৃথ্বী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশকে পরে বলা হয়েছে পঞ্চ মহাভূত।

জড় ও জীবের উৎপত্তিসমস্যার সমাধান করেই বৈদিক যুগের মনীষীরা নিশ্চিন্ত ছিলেন না। সৃষ্টির কারণ সম্বন্ধেও অনুসন্ধান করতে চেষ্টা করেছিলেন। সাংখ্যের মতে পুরুষের সংযোগে অব্যক্ত মূল প্রকৃতিতে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। প্রকৃতি অচেতন কিন্তু পুরুষের সংস্পর্শে সক্রিয় হয়ে সে নানাভাবে অভিব্যক্ত হতে থাকে। তখন তার সাম্য-অবস্থা ভেঙে যায় ও পার্থক্য শুরু হয়; তখনই দেখা দেয় 'মহৎ' বা বুদ্ধি, তারপর অহংকার। এই অহংকারের কারণেই মানুষের ইন্দ্রিয়সকল গড়ে উঠল— পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় ও মন, এই এগারোটা ইন্দ্রিয় সত্ত্বগুণের প্রাবল্যে উৎপন্ন। আর, অহংকারের সঙ্গে যখন তমোগুণের উৎকর্ষ হয় তখনই নিরিন্দ্রিয় পঞ্চ মহাভূতের সৃষ্টি।

এই গেল সৃষ্টির গোড়াকার কথা। তারপর দেখা যাক, ঋষিরা বিশেষভাবে জীবের উৎপত্তি সম্বন্ধে কী বলেছেন। ঐতরেয় উপনিষদে (৩।৩) আছে, জীব চার রকমের— অণ্ডজ, জরায়ুজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ। কোনো কোনো উপনিষদে (যথা ছান্দোগ্য ৬।৩) স্বেদজ বাদ দিয়ে— অণ্ডজ, জীবজ ও উদ্ভিজ্জ মাত্র এই তিন রকম জীবের উল্লেখ আছে। কিন্তু সমন্বয় রক্ষা করবার জন্য বেদান্তসূত্রে (৩।১।২১)

স্বেদজকে উদ্ভিজ্জের অন্তর্ভুক্ত মনে করেছেন। ঋগ্‌বেদে বর্ণনা আছে—বিরাট পুরুষের জন্য দেবতারা যে যজ্ঞ করেছিলেন বসন্ত, গ্রীষ্ম, শরৎ প্রভৃতি সব ঋতু হয়েছিল সেই যজ্ঞের উপাদান। তার থেকেই গরু, ছাগল, ঘোড়া প্রভৃতি পশুপক্ষীর উৎপত্তি হয়। এবং সেই বিরাট পুরুষের মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, উরু থেকে বৈশ্য এবং চরণ থেকে শূদ্র উৎপন্ন হয়। এই যজ্ঞে বিরাটপুরুষের অবয়ব ও ইন্দ্রিয়গুলি কী ক্রমানুসারে উদ্ভিন্ন হল তার বর্ণনা পাওয়া যায় নানান উপনিষদে ও ভাগবত-পুরাণে। সৃষ্টি তিনপ্রকার— প্রাকৃত, বৈকৃত অথবা বৈকারিক ও উভয়াত্মক। এই তিনপ্রকার সৃষ্টি কখন কি ভাবে হয়েছে তার সবিশেষ প্রণালী নিচে দেওয়া যাচ্ছে (ভাগবত, ৩য় স্কন্ধ, ১ম অধ্যায়, ইত্যাদি দ্রষ্টব্য)—

প্রাকৃত সৃষ্টি

প্রথম। মহৎ (ভগবানের সকাশ থেকে গুণসমূহের বৈষম্য)

দ্বিতীয়। অহংকার (যা থেকে দ্রব্য-জ্ঞান-ক্রিয়ার প্রকাশ)

তৃতীয়। পঞ্চতন্মাত্র (ভূতসূক্ষ্মের উদ্ভব)

চতুর্থ। জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়

পঞ্চম। মন

ষষ্ঠ। অবিদ্যা (যা দ্বারা জীবগণের মোহ জন্মে)

বৈকৃত বা বৈকারিক সৃষ্টি

সপ্তম। স্থাবর বা মুখ্য সৃষ্টি

১ বনস্পতি (ফুল ছাড়া ফল দেয় যে বৃক্ষ)

২ ওষধি

৩ লতা

৪ ত্বক্‌সার (বাঁশ)

৫ বীরুধ্‌ (শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত বা কঠিন লতা)

৬ বৃক্ষ (পুষ্প হ'য়ে ফল হয় যার)

অষ্টম। তির্যগ্‌ (ইহারা ভবিষ্যদ্‌জ্ঞানশূন্য, তমোজ্ঞানবিশিষ্ট, দীর্ঘানুসন্ধানশূন্য ও আহারাদিতে মাত্র তৎপর)

১ দ্বিশফ (গো, ছাগ প্রভৃতি দুই খুরওয়ালা জন্তু)

২ একশফ (অশ্ব, চমরী প্রভৃতি একটি খুরওয়ালা জন্তু)

৩ পঞ্চনখ (কুক্কুর, শৃগাল, বিড়াল প্রভৃতি)

৪ জলচর (মকর, মৎস্য প্রভৃতি)

৫ খেচর (গৃধ্র, বক, শ্যেন প্রভৃতি)

নবম। মানুষ

উভয়াত্মক সৃষ্টি

দশম। সনৎকুমার প্রভৃতি এবং দেবাত্মক গন্ধর্ব, কিন্নর ইত্যাদি

স্ত্রীপুরুষভেদ সম্বন্ধে ভাগবতের অন্যত্র (৩য় স্কন্ধ, ১১শ অধ্যায়ে) উল্লেখ আছে— ব্রহ্মা বহুবিধ মানসপুত্র উৎপন্ন করলেও যখন দেখলেন তাঁর সৃষ্টির প্রসার হচ্ছে না তখন চিন্তান্বিত হয়ে নিজের শরীর দ্বিধা বিভক্ত করলেন। এক ভাগ থেকে 'স্বয়ম্ভুবমনু'-নামক পুরুষ ও অন্য ভাগ থেকে 'শতরূপা'-নাম্নী নারী সৃষ্টি হল। তারপর মিথুন-ধর্মাশ্রয়ে প্রজাবৃদ্ধি হ'তে লাগল।

গ্রীক তত্ত্বজ্ঞানীরাও খুব প্রাচীনকাল থেকেই জীবের উৎপত্তি সম্বন্ধে ভাবতে আরম্ভ করেন। খ্রীস্টের ৬০০ বছর পূর্বে অ্যানাক্সিম্যাণ্ডার (Anaximander)-কে দেখা যায় বলতে— জল থেকে সমস্ত পদার্থের

উৎপত্তি হয়েছে, সামুদ্রিক জীবাণু থেকে অন্যান্য জীব ক্রমশ গড়ে উঠেছে। তাঁর একশ' বছর পরে এম্‌পিডোক্লিস (Empedocles) এক ধাপ এগিয়ে বললেন যে, প্রথমে গাছপালা দিয়ে শুরু করে ক্রমশ জন্তু-জানোয়ারের সৃষ্টি হয়েছে, এবং সেই সৃষ্টি হঠাৎ হয় নি, বহুকাল লেগেছে হতে। তিনি বলেন, জগতে দু'রকম শক্তি কাজ করে, একটি রাগ ও অন্যটি বিরাগ। জড় প্রকৃতিতে চারটি তত্ত্ব আছে— পৃথ্বী, জল, তেজ ও বায়ু। রাগ ও বিরাগ এই দুই শক্তির সংঘাতে এই চারটি মহাতত্ত্ব থেকে যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে। এই পরিকল্পনার সঙ্গে ভারতীয় পঞ্চমহাভূতের ধারণা তুলনীয়। ঐতিহাসিকেরা বলতে পারবেন, গ্রীকরা এই ধারণা ভারতবর্ষ থেকে পেয়েছিলেন কি না।

এম্‌পিডোক্লিস্ ও তাঁর শিষ্যবর্গের মধ্যে আনুশ্রুতিক বিশ্বাস ও বিজ্ঞান মিশে রয়েছে বোঝা যায়। আসলে আরো এক শতাব্দী পরে অ্যারিস্টট্‌ল্ (Aristotle) এর সময় থেকে গ্রীকদের মধ্যে খাঁটি বিজ্ঞান জন্ম নিল। তিনিই প্রথম গাছপালা জন্তুজানোয়ার ভালো করে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখতে চেষ্টা করলেন। জন্তুদের মধ্যে তিনি পাঁচশ'র অধিক জাতি নির্ণয় করেন। জীববিজ্ঞান সম্বন্ধে তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন তা সংক্ষেপে এই : প্রকৃতির মধ্যে বিভিন্ন স্তর আছে। অসম্পূর্ণ থেকে সম্পূর্ণের দিকে, অনুন্নত থেকে উন্নতের দিকে ধাপে ধাপে অগ্রগতি হয়েছে। সবনিচের ধাপে জড়বস্তু, তারপর গাছ-গাছড়া, সবশেষে জন্তুজানোয়ার। জন্তুদের চেতনাশক্তি থাকাতে তাদের আহারের ইচ্ছা ও অন্যান্য ইচ্ছা এবং তার থেকে চলাফেরার প্রয়াস। নিম্নশ্রেণীর জন্তু থেকে ক্রমশ মানুষ গড়ে উঠেছে। অ্যারিস্টট্‌লের মতবাদের যে বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা দরকার, যার উপর তিনি নিজেও খুব ঝোঁক দিয়েছিলেন সেটি হচ্ছে— প্রকৃতির মধ্যে যে নিত্য-

নূতন পরিবর্তন দেখা যায় তার মধ্যে একটি ধারাবাহিক গতি আছে, প্রকৃতি সর্বদাই চেষ্টা করছে অপূর্ণতাকে পূর্ণতায় আনতে, অসুন্দরকে সুন্দর করে তুলতে। এর ভিতর একটা সচেতন চেষ্টা ও নির্মাণকুশলী মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

অ্যারিস্টটলের পর গ্রীসে বিজ্ঞানের আর বেশি কিছু উন্নতি হয় নি। ইউরোপে খ্রীস্টান ধর্মের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান চাপা পড়ে রইল। বাইবেলের বুক অফ্ জেনেসিস্ (Book of Genesis)-এ জীবজগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে অলৌকিকবাদ প্রচারিত হয়েছিল ধর্মযাজকদের পীড়নের ভয়ে তার বিরুদ্ধে কোনো আলোচনা উপস্থিত করতে কারো সাহস হয় নি। কয়েক শতাব্দী ধরে স্বাধীন চিন্তা একরকম বন্ধই ছিল। ইউরোপের যখন এই দশা তখন কিন্তু আরবদেশে বিজ্ঞানের চর্চা বেশ চলছে। মুসলমানরা এই সময় স্পেন অধিকার করে বসেছে। সেখানে আবুবাকের প্রমুখ কয়েকজন পণ্ডিত জ্যোতির্বিজ্ঞান, পৃথিবীর ভৌগোলিক ইতিহাস, প্রাণীর উৎপত্তি ও জীবনপ্রণালী সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কার করেছিলেন। অ্যারিস্টটলের সময়ে গ্রীসে বিজ্ঞানের যতটা উৎকর্ষ হয়েছিল এই যুগের (৮০০-১০০০ খ্রীস্টাব্দ) আরব তত্ত্বজ্ঞানীরা সেই বিদ্যা আরো একটু এগিয়ে দিয়েছিলেন।

কিন্তু, এ কথা আমাদের মানতেই হবে, বিজ্ঞান, বিশেষত ক্রমবিবর্তন সম্বন্ধে, পুরাকালের এইসব আলোচনা নিতান্ত অগভীর। এঁদের গবেষণার মধ্যে জীবজগৎ সম্বন্ধে জানবার কৌতূহলটুকুর পরিচয়মাত্র পাওয়া যায়, তার বেশি কিছু নয়। অভিব্যক্তি সম্বন্ধে গভীরতর গবেষণার জন্য আমাদের ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। সেই সময় ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বেকন (Bacon),

দেকার্তে (Descartes), লীব্‌নিট্‌স (Liebnitz), হিউম্ (Hume), স্পিনোজা (Spinoza), কান্ট্ (Kant), লেসিং (Lessing) প্রভৃতি যে একদল তত্ত্বজ্ঞানী জন্মেছিলেন তাঁরাই অভিব্যক্তি সম্বন্ধে আধুনিক বৈজ্ঞানিক ধারণার পথপ্রদর্শক। তাঁরাই প্রথম অন্ধ বিশ্বাস ত্যাগ করে সাহসের সঙ্গে প্রচার করলেন কার্যকারণের অচ্ছেদ্য-সম্বন্ধনির্ভর বিচারমূলক যুক্তিবাদ। সেই থেকে কার্যকারণের সম্বন্ধের উপর বিজ্ঞান জন্ম নিল। তারপরেই খাঁটি বিজ্ঞানের যুগ এল উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায়। ডারুউইন ও লামার্কের জন্ম সেই সময়। একজন ইংলণ্ডে, অন্যজন ফরাসীদেশে। দুজনেরই প্রাণীদের সম্বন্ধে অগাধ জ্ঞান; প্রত্যেক প্রাণীর জীবনপ্রণালীর সূক্ষ্মতম ঘটনা তাঁরা ভালো করে জানতে চেষ্টা করেছিলেন, তারপর সেই ঘটনাবলীর কার্যকারণ বিচার করে জীবের ক্রমবিবর্তন সম্বন্ধে নিজেদের মতবাদ খাড়া করেন। এই সম্বন্ধে সুসংগত বৈজ্ঞানিক মতবাদ এই প্রথম সৃষ্টি হল।

লামার্ক্ ও ডারুউইনের মতবাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য থাকলেও দু'জনেই ক্রমবিবর্তন সমর্থন করেছেন এবং তাঁদের মতবাদের ভিত্তি একই রকম ঘটনা ও যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই দুই মতবাদের বৈসাদৃশ্য কোথায় সে বিষয় পরে যথাস্থানে আলোচনা করা যাবে। আপাতত সুবিধার জন্য অভিব্যক্তিবাদ বলতে ডারুউইনের মতবাদই ধরে নেওয়া হবে।

ক্রমবিবর্তন ডারুউইন বা আর কোনো আধুনিক বিজ্ঞানীর একেবারে নূতন আবিষ্কার যে নয় তা আগে বলা হয়েছে। বহুকাল থেকে এ বিষয়ে আলোচনা হয়ে আসছে। কিন্তু পূর্বে সেই আলোচনা মুষ্টিমেয় বিজ্ঞানী বা তত্ত্বজ্ঞানীর মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। সাধারণ লোকের

মধ্যে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা চলে আসছিল। তাই ডার্‌উইন তাঁর মতবাদ যখন প্রকাশ করলেন তখন তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হল। আক্রমণকারীদের মধ্যে খ্রীস্টীয় ধর্মযাজকদের আক্রোশ সবচেয়ে বেশি ছিল। এখনো তাঁরা সম্পূর্ণ নিরস্ত হন নি। তাঁদের আপত্তির কারণ, অভিব্যক্তিবাদ বিশ্বাস করলে বাইবেলের অনেক কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু তাঁদের আপত্তি টিঁকল না।

ডার্‌উইন ক্রমবিবর্তনকে তথ্য হিসাবে পাকা ভিতের উপর দাঁড় করিয়ে দিলেন। ক্রমবিবর্তনের প্রণালী সম্বন্ধেও বেশ একটা যুক্তিসংগত বিশ্বাসযোগ্য মতবাদ বিজ্ঞানীদের সামনে উপস্থিত করলেন। সকলে সেই মতবাদ গ্রহণ না করলেও তিনি বিজ্ঞানীদের মনে এমন একটি নাড়া দিলেন যে, তাঁরা নানান দিক থেকে ক্রমবিবর্তনের প্রমাণ সংগ্রহ করতে কোমর বেঁধে লেগে গেলেন। আজও সেই উৎসাহ কিছুমাত্র কমে নি।

ডার্‌উইনের মতবাদ-প্রচারের পরবর্তী কয়েক বছর এই কাজেই সকলে খুব ব্যস্ত ছিলেন দেখা যায়। ক্রমবিবর্তন সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের যতই অভিজ্ঞতা বাড়তে লাগল ডার্‌উইনের মতবাদ নিয়ে তর্কবিতর্ক ততই প্রশ্রয় পেল। ডার্‌উইনের বিরুদ্ধদলকে নিরস্ত করবার জন্য হাক্‌স্‌লি (Huxley), হেকেল (Haeckel) প্রভৃতি তাঁর শিষ্যবর্গ তাঁদের হাতে যতকিছু অস্ত্র ছিল ভালো করে শান দিয়ে যুদ্ধং দেহি বলে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। হাক্‌স্‌লি নিজেকে অভিহিত করলেন ডার্‌উইনের বুলডগ্ (Darwin's Bulldog) বলে। বিজ্ঞানসমাজে আর কোনো মতবাদ নিয়ে এত বাগ্‌বিতণ্ডার ঝড় কখনো বয় নি। যদিও ডার্‌উইনের অভিব্যক্তিবাদ মোটের উপর সকলকে মেনে নিতে হয়েছে কিন্তু এখন পর্যন্ত, অর্থাৎ ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে

ডারুউইনের অরিজিন অফ্ স্পিসিজ্ (Origin of Species) গ্রন্থ-প্রকাশের প্রায় এক শতাব্দী পরেও, তাঁর মতবাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা বন্ধ হয় নি। এর থেকে এইটাই প্রমাণ হয়, ডারুউইনের মতবাদ জনসমাজে প্রচণ্ড বিপ্লব এনে দিয়েছে। এই মতবাদ কেবল যে বিজ্ঞানীদের নাড়া দিয়েছে তা নয়, গত শতাব্দীর সাহিত্যে, সমাজে, রাজনীতিতে মানুষের সমস্ত চিন্তার ধারাতেই তার প্রভাব বিস্তার করেছে। সেইজন্য ক্রমবিবর্তন ও অভিব্যক্তিবাদ ব্যাপার কী তা বিজ্ঞানী-অবিজ্ঞানী আমাদের সকলেরই জানা নিতান্ত প্রয়োজন।

ক্রমবিবর্তন

জগৎটা একদিনে তৈরি হয় নি, ক্রমশ তার বিবর্তন হয়েছে, কথাটা সত্য: দেখতে পাই প্রাচীনকাল থেকে ডারুউইন পর্যন্ত সকলেই এটা মেনে নিয়েছেন। তাঁরা ক্রমবিবর্তন সত্য, বিশ্বাস করেন বলেই বিবর্তন কি করে হল তার কারণ খুঁজে বের করতে চেষ্টা করেছেন। ক্রমবিবর্তনের আলোচনা-প্রসঙ্গে আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে, ক্রমবিবর্তনের তথ্য আর ঐ সম্বন্ধে তত্ত্ব— এ দুটি এক নয়। আমরা তথ্য হিসাবে ক্রমবিবর্তন মেনে নিয়েও লামার্ক্ বা ডারুউইনের বা অন্য কারো ক্রমবিবর্তনতত্ত্ব বা অভিব্যক্তিবাদ বিশ্বাস নাও করতে পারি। প্রাকৃতিক ঘটনা চিরন্তন সত্য— কিন্তু তার থেকে কতকগুলি ঘটনাবলী বেছে নিয়ে তার কারণ সম্বন্ধে নানান মতবাদ খাড়া করা যায়, সেগুলি সব সত্য নাও হতে পারে। ডারুউইনের অভিব্যক্তিবাদ সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করতে পারি কিন্তু ক্রমবিবর্তন বা অভিব্যক্তি সম্বন্ধে এখন আর অবিশ্বাস করা যায় না। তার সত্যতা প্রতিপন্ন করে প্রচুর প্রমাণ সংগৃহীত হয়েছে।

ক্রমবিবর্তন বলতে কি বোঝায়, সে বিষয়ে কি কি ঘটনা জানতে পেরেছি, আমরা প্রথমে তারই আলোচনা করব। তারপর সেইসব ঘটনার উপর নির্ভর করে কি কি মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে, তার কোনটি কতখানি বিশ্বাস্য, পরে বিচার করা যাবে। আপাতত

মতবাদের কথা ছেড়ে দিয়ে দেখা যাক পৃথিবীতে জীবের বিবর্তন বা অভিব্যক্তি কি ভাবে হয়েছে, বিজ্ঞানীরা আমাদের এ বিষয়ে কতখানি খবর দিতে পারেন।

অভিব্যক্তি বলতে এক থেকে আর-একের উদ্ভব বোঝায়, পূর্বে যা ছিল তার কিছু না কিছু পরিবর্তন হয়ে নতুনের আবির্ভাব। কিন্তু, কেবল তাই নয়, এর ভিতরে আর-একটু কথা আছে। জগৎ পরিবর্তনশীল, কিন্তু সেই পরিবর্তনের মধ্যে খানিকটা নিয়ম দেখতে পাওয়া যায়, তার মধ্যে ধারাবাহিকতা আছে, নিতান্ত এলোমেলো যথেচ্ছ পরিবর্তন যদি হত তাহলে তাকে ঠিক অভিব্যক্তি বলা চলত না। শ'খানেক বছর ধরে প্রাণিতত্ত্ববিৎ, ভূতত্ত্ববিৎ প্রভৃতি নানান বিজ্ঞানীরা যে সব তথ্য ও প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন তা যদি ঠিকমতো সাজানো যায় তবে দেখা যাবে, সেগুলি অসংলগ্ন নয়। একটির সঙ্গে আর-একটির কালানুক্রমিক যোগসূত্র রয়েছে। তা ছাড়া আরো দেখা যাবে, জীব-ইতিহাসের প্রত্যেক ঘটনার মানে আছে, ইতিহাসের পর্যায়ে তার প্রত্যেকটির একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে; তাদের পরস্পরের মধ্যে গতানুগতিক সম্বন্ধ এবং কার্যকারণের বন্ধন আছে।

ক্রমবিবর্তনের প্রমাণ নানান দিক থেকে পাওয়া গেছে, যে-বিজ্ঞানী যে-বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তিনি সেইদিক থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন। প্রমাণগুলিকে মোটের উপর তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।—

(১) ঐতিহাসিক প্রমাণ। জীবের প্রত্যেক জাতি বা উপজাতির অতীত জীবনের ইতিহাস থেকে যে সব প্রমাণ পাওয়া যায়। জীবপ্রত্নতত্ত্বজ্ঞদের প্রধান কাজ হচ্ছে সেই ইতিহাস আবিষ্কার

করা। পৃথিবীর বিভিন্ন স্তর থেকে জীবাশ্ম (fossil) সংগ্রহ করে তার থেকে জীবের পুরাবৃত্ত গড়ে তোলবার তাঁরা চেষ্টা করেন।

(২) দেহগঠনের তুলনামূলক প্রমাণ। বিভিন্নজাতীয় জীবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তুলনা করে যে সব প্রমাণ পাওয়া যায়।

(৩) ভ্রূণগঠনের তুলনামূলক প্রমাণ। মাতৃগর্ভে ভ্রূণের ক্রম-পরিণতির সময় যেভাবে তার পরিবর্তন হয় তার থেকে সেই জীবের পূর্ব ইতিহাসের পরিচয় পাওয়া যায়। নানাজাতির জীবের ভ্রূণের ক্রমবিকাশ তুলনা করে ক্রমবিবর্তনের অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে।

(৪) ভৌগোলিক প্রমাণ। পৃথিবীর এক-এক অঞ্চলে এক-এক ধরনের জীবজন্তু দেখা যায়। যে-দেশ পৃথিবীর অন্যদেশ থেকে যত বিচ্ছিন্ন সেখানকার জীবজন্তুর প্রকৃতিও তত ভিন্ন। ক্রমবিবর্তনের ফলে এইরূপ বৈচিত্র্য ঘটেছে, অনুমান করা যায়।

ঐতিহাসিক প্রমাণ

পৃথিবীর ভূমিভাগ পরীক্ষা করলে দেখতে পাওয়া যায়, তার ভিতর অনেক স্তর আছে। মাটি, বালি বা পাথর যেখানে যা আছে সবই থাকে-থাকে যেন সাজানো। জমি তৈরি করে জল। নদীর জল পাহাড় থেকে মাটি বয়ে নিয়ে এসে নিচু জমিতে, জলাশয়ে বা সমুদ্রতলে প্রতিবছর একটি করে পলিমাটির স্তর বিছিয়ে দিয়ে যায়। বছরের পর বছর এইরকম পলি পড়ে পড়ে জমি উঁচু হতে থাকে। যখন অনেক উঁচু হয়ে যায় তখন নিচের মাটি উপরের স্তরগুলির চাপে শক্ত হয়ে পাথর

হতে থাকে। স্তরের চেহারা ও বস্তুসংগঠন দেখে কোন্ স্তরটি কত বছরের পুরানো তা ভূতত্ত্ববিৎরা সঠিক নির্ণয় করতে পারেন। যে স্তর যে সময়ে তৈরি হয়েছে সেই যুগের জীবজন্তুর ধ্বংসাবশেষ নিশ্চয়ই তার ভিতর থেকে গেছে আমরা ধরে নিতে পারি। গাছের ফল, পাতা, ডালপালা বা গুঁড়ি ও জন্তুর অস্থিসার মাটির তলায় খোঁজ করলে সত্যই প্রচুর পাওয়া যায়। উপরের স্তরের চাপে সেগুলিও ক্রমশ পাথর হয়ে যায়। তাকেই জীবাশ্ম বা ফসিল্ বলে। যে-স্তরে যে-ফসিল্ পাওয়া যায়, ফসিলের বয়সও নিশ্চয়ই সেই স্তরের অনুরূপ। মাটির তলা থেকে যত ফসিল বেরোয় সেগুলি কোন্ যুগের তা ভূতত্ত্ববিৎরা আমাদের এই উপায়ে সহজেই বলে দিতে পারেন।

গত শতাব্দীতে নানান জীবজন্তুর ফসিল সংগৃহীত হয়েছে। সেগুলি নানা দেশের মিউজিয়ামে সযত্নে রক্ষিত। যে-কোনো মিউজিয়ামে গেলে এইসব ফসিল-সংগ্রহ আমরা দেখতে পারি। ইচ্ছা করলে আমরা প্রত্যেকেই এই সংগ্রহের কাজে সাহায্য করতে পারি। বাংলার বীরভূম জেলায় শান্তিনিকেতনের আশেপাশে অনেক ফসিল আমাদের নজরে পড়েছে। ঐ অঞ্চলের জমি ছোটোনাগপুরের মতো ঢেউখেলানো উঁচুনিচু। বর্ষার জলে উপরের মাটি ধুয়ে গিয়ে অনেক জায়গায় নিম্নস্তরের পাথর-মেশানো কাঁকর বেরিয়ে পড়েছে। কাঁকর-বের-করা সেই অনুর্বর ভাঙাচোরা জমিকে ঐ দেশের লোকেরা 'খোয়াই' বলে। শান্তিনিকেতনের ছাত্রেরা খোয়াইয়ের ভিতর বেড়াতে গিয়ে নানারকম পাথরের টুকরা কুড়িয়ে নিয়ে আসে। তার মধ্যে অনেক সময় ফসিল থাকে— পাথর-হওয়া কাঠের টুকরো বা তালের আঁঠির মত ফল। যার কপাল ভালো তার

ভাগ্যে কদাচিৎ ফ্লিণ্ট্ (flint) পাথরের ফলকও মিলে যায়। এইগুলি পাথরের যুগে (Stone Age) মানুষ তীর বা কুড়ুলের ফলার জন্য ব্যবহার করত। বীরভূমের জমি ল্যাটেরাইট (laterite), নিম্ন-বাংলার পলি-পড়া (silt-basin) জমি অপেক্ষা প্রাচীন। সেখানকার জমির নিম্নস্তর থেকে প্রাচীন যুগের ফসিল পাওয়া বিচিত্র নয়।

তা হলে দেখা যাচ্ছে, জীবজন্তুর ইতিহাস আবিষ্কার করতে গেলে প্রথমে মাটির স্তরগুলির বয়সের হিসাব ঠিক করা দরকার। ভূতত্ত্ববিৎরা সে কাজটি আগে থেকে করে রেখে আমাদের খুব সুবিধা করে দিয়েছেন। তাঁরা দেখেছেন, ভূস্তরগুলি [illegible] গড়ে ওঠে নি, সময়ের পর্যায় অনুসারে তৈরি হয়েছে। মাঝে মাঝে কেবল আগ্নেয়গিরি থেকে উৎক্ষিপ্ত অগ্নিশিলা এসে পড়ে এই স্তরবিন্যাস ভেঙে দিয়েছে। পৃথিবীর কালক্রমিক ইতিহাস মাটি বা পাথরের স্তরে স্তরে লেখা আছে বলা যেতে পারে। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাস মানব-ইতিহাসের মতো দু'চার হাজার বছরের সীমায় কুলোয় না। সে ক্ষেত্রে কোটি বছরের হিসাব লাগে। কাজের সুবিধার জন্য পৃথিবীর ইতিহাস ভাগ করা হয়েছে (১) মহাযুগ (Era), (২) যুগ (Epoch বা Period) ও (৩) প্রযুগ (Sub-period) মোট এই তিন ভাগে। ভূবিজ্ঞানে এর যে হিসাব প্রচলিত তার তালিকা পরে দেওয়া যাচ্ছে।

অভিব্যক্তির কাল-

প্রাণীর প্রথম

কঠিন [illegible] স্বল্পকোষী

আর্কেওজোয়েক মহাযুগ
(Archaeozoic Era)
৫ কোটি বছর পূর্বে

প্রোটেরোজোয়েক মহাযুগ
(Proterozoic Era)
২ কোটি ৫০ লক্ষ বছর পূর্বে

ক্যাম্ব্রিয়ান যুগ (Cambrian Period)

অর্ডোভিসিয়ান যুগ (Ordovician Period)

প্যালেওজোয়েক মহাযুগ
(Paleozoic Era)
২ থেকে ২½ কোটি বছর পূর্বে

সিলুরিয়ান যুগ (Silurian Period)

ডেভোনিয়ান যুগ (Devonian Period)

কার্বনিফেরাস যুগ (Carboniferous Period

ট্রিয়াসিক যুগ (Triassic Period)

যুরাসিক যুগ (Jurassic Period)

মেসোজোয়েক মহাযুগ
(Mesozoic Era)
৫০ লক্ষ থেকে ১ কোটি বছর পূর্বে

ক্রেটেসিয়াস যুগ (Cretaceous Period)

সেনোজোয়েক মহাযুগ
(Cenozoic Era)
৩০ থেকে ৫০ লক্ষ বছর পূর্বে

ক্রমিক ইতিহাস

আবির্ভাব

সামুদ্রিক জীবাণু

ট্রাইলোবাইট (Trilobite) প্রমুখ প্রচুর কঠিন আবরণযুক্ত সামুদ্রিক জীব। যথেষ্ট পরিমাণ ফসিল।

শামুখের প্রাচুর্য।

সমুদ্রে মাছের ও ডাঙায় নগণ্য অপুষ্পক উদ্ভিদের আবির্ভাব। কয়েক রকম বিছাজাতীয় জন্তু।

মাছ ছাড়া অন্যান্য নানাবিধ সামুদ্রিক জন্তু। ডাঙার উদ্ভিদের প্রসার। কীটপতঙ্গের প্রাদুর্ভাব।

ডাঙায় ঘন বনজঙ্গল। জলা জমিতে ফার্ন (fern), মশ (moss) প্রভৃতি উদ্ভিদের প্রাচুর্য। সরীসৃপের আবির্ভাব। ইহার শেষাংশে সাইকাড (cycad) শ্রেণীর বৃক্ষের আবির্ভাব।

ডাঙায় জন্তুদের উন্নতি। ডাইনোসর (Dinosaur) প্রভৃতি অতিকায় জানোয়ারদের আধিপত্য। স্তন্যপায়ী জন্তুর আবির্ভাব।

সামুদ্রিক জীবের বৈচিত্র্য। ডাঙায় সাইকাড বৃক্ষের উন্নতি। দাঁতওয়ালা সরীসৃপ; তার থেকে ক্রমশঃ পাখির আবির্ভাব।

সপুষ্পক উদ্ভিদের আবির্ভাব। পাম (Palm) বৃক্ষশ্রেণী। অতিকায় জন্তুজানোয়ারদের অবনতি।

ইওসিন প্রযুগ (Eocene Sub-period)	
অলিগোসিন প্রযুগ (Oligocene Sub-period)	সপুষ্পক উদ্ভিদের উন্নতি। আধুনিক পাখি।
মিয়োসিন প্রযুগ (Meocene Sub-period)	আধুনিক সপুষ্পক বৃক্ষের উন্নতি।
প্লিয়োসিন প্রযুগ (Pliocene Sub-period)	উদ্ভিদের সর্বতোভাবে উন্নতি।
প্লিষ্টোসিন প্রযুগ (Pleistocene Sub-period	অতিকায় জন্তুদের বংশলোপ। মানুষের পূর্বপুরুষের আবির্ভাব।

এই তালিকায় আমরা দেখতে পাচ্ছি, প্রাচীনতম মহাযুগ বা আর্কিয়োজোইক ইরা (Archaezoic Era) শেষ হল ১১০ কোটি বছর পূর্বে। আরো কত কোটি বছর পূর্বে এর আরম্ভ হয়েছিল তা বলা কঠিন। ভৌগোলিক যুগের ব্যাপ্তি আমাদের পক্ষে ধারণা করা কঠিন। শতাব্দী নিয়ে যারা কারবার করি হঠাৎ কোটি বছরের হিসাব সামনে ধরলে বিপন্ন হতে হয়। তবে এইরকম বড় বড় অঙ্কের সঙ্গে আমাদের পরিচয় আজকাল যথেষ্ট হচ্ছে। পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বে হাজার কোটি মাইলের হিসাব করতে হয়, তার কাছে দু-একশ কোটি অবশ্য কিছু নয়।

ভূপ্রত্নতত্ত্ববিৎরা পৃথিবীর নানান স্তর থেকে যেসব ফসিল জোগাড় করেছেন তার থেকে জানা যায়, জীবের আবির্ভাব হয়েছিল অতি সূক্ষ্ম ও অতি সহজ মূর্তি নিয়ে, তারপর কোটি কোটি বছর ধরে একটু একটু বদল হয়ে এখনকার এত বিচিত্র ও এত উচ্চাঙ্গের জীব তৈরি হয়েছে। কোন্ যুগে কোন্ জীবের উৎপত্তি হয়েছে ধারাবাহিকভাবে সাজালে বোঝা যায়, পৃথিবীর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে জীবজন্তু ক্রমশ উন্নতির পথেই এগিয়েছে। ক্রমবিবর্তনের প্রমাণ আমরা ভূবিজ্ঞান থেকেই প্রধানত পেয়েছি।

আর্কিয়োজোইক মহাযুগের বিষয় আমরা বিশেষ কিছু জানি না, তবে সন্দেহ নেই যে, ঐ মহাযুগের কোনো সময় প্রাণী প্রথম দেখা দিয়েছিল। সেই সময়কার পাথরের স্তরে যে সামান্য প্রাণীচিহ্ন পাওয়া গেছে তার থেকে আন্দাজ করতে পারা যায় যে, অ্যামিবা, ব্যাকটিরিয়া, অ্যাল্‌জি, স্পঞ্জ ও কয়েক রকম সামুদ্রিক ঘাস তখন জন্মেছিল। হয়তো দু-এক রকম কীটও জন্মে থাকতে পারে। প্রোটারজোইক মহাযুগে এ ছাড়া অন্য নতুন বিশেষ কোনো প্রাণীর সন্ধান

পাওয়া যায় না। সে সময়ে অ্যাল্‌জি ও স্পঞ্জ্‌ বেশি করে দেখা যায়। এই মহাযুগের শেষের দিকে পৃথিবী অনেক কাল তুষারাচ্ছাদিত ছিল ; হতে পারে, তার জন্যে ক্রমবিবর্তন বাধা পায়। এই দুই মহাযুগ অত্যন্ত আদিম অবস্থার যুগ, তখনও পৃথিবীর আবহাওয়া জীবের প্রাণধারণের অনুকূল হয় নি। সেইজন্য প্যালিয়োজোইক মহাযুগে পৌঁছে তবে জীবজন্তুর বাহুল্য দেখতে পাই। এর আরো একটু কারণ থাকতে পারে। পূর্বে সামুদ্রিক জলে চুনের অভাব ছিল, সেইজন্য তখনকার প্রাণীদের শরীরে হাড় ব' শক্ত কোনো খোলস হতে পারত না, মাংসল দেহ ছিল। তাই তাদের ফসিল পাওয়া যায় না।

প্যালিয়োজোইক মহাযুগে শামুকের মত শক্ত আবরণওয়ালা জীবের চিহ্ন প্রথম পাওয়া গেল। এই মহাযুগের গোড়ার দিকে ক্যাম্‌ব্রিয়ান্‌ যুগকে বিশেষভাবে ট্রাইলোবাইট্‌ (Trilobite)-দের যুগ বলা চলে। তা ছাড়া তখন যথেষ্ট পরিমাণে জেলিফিশ্‌ (Jelly fish), ইকাইনোডারম্‌ (Echinoderm), নানা রকম ক্রাস্টেশ্যান মোলাস্‌ক্‌ (Crustacean molluscs) জাতীয় জলজীব জন্মেছে। তারপর অর্দোভিসিয়ান্‌ যুগে ট্রাইলোবাইট্‌ (Trilobite)-দের জায়গা নিয়েছে ইউরিপ্‌টেরিড্‌স্‌ (Eurypterids)। এরা কাঁকড়াবিছা ও মাকড়সার পূর্বপুরুষ, জলে বাস করে বলে সাধারণত সামুদ্রিক বিছা নামে পরিচিত। এই মহাযুগের একেবারে শেষে সিলুরিয়ান্‌ যুগে মাছের চিহ্ন প্রথম পাওয়া যায়। কিন্তু তখনকার মাছের ভালো রকম কাঁটা বিশেষত শক্ত চোয়াল হয় নি। এই প্রথম মেরুদণ্ডী জীবের সৃষ্টি। মেরুদণ্ড তৈরি হওয়া সেইটাই জন্তুর ক্রমবিবর্তনের যথেষ্ট এক ধাপ এগোনো। জলজন্তুর মধ্যে তা প্রথম দেখা দিল, মেরুদণ্ডী ডাঙার জন্তু জন্মাতে আরো কয়েক যুগ লেগেছিল।

এতদিন পর্যন্ত পৃথিবী জলময় ছিল, ডাঙা বেশি তৈরি হয় নি। জমি যখন উঁচু হয়ে বিস্তৃতভাবে দেখা দিল তখনও বহুকাল পর্যন্ত তা নগ্ন অবস্থায় পড়ে ছিল। এখনকার শ্যামল সবুজ পৃথিবীর তুলনায় সে কী ভয়ংকর শূন্য শুষ্ক মরুভূমি! জলে তখন জীবের অভাব নেই কিন্তু ডাঙা একেবারে নিষ্প্রাণ। ডাঙার উপর গাছপালা শুরু হল সামুদ্রিক ঘাসের পরিবর্তন হয়ে। জল যেমন সরে যেতে লাগল এই সামুদ্রিক ঘাস শিকড় গজিয়ে, শক্ত কাণ্ড ও বল্কল গড়ে তুলে শুকনো ডাঙার উপযোগী হতে চেষ্টা করল। ডেভোনিয়ান্ যুগের গোড়ার দিকে রাইনিয়া (Rhynia), হর্নিয়া (Hornea) প্রভৃতি দু-চার রকম উদ্ভিদের যা নমুনা পাওয়া যায়, তারা খানিকটা ফার্ন (fern), খানিকটা মস্ (moss), বা কতকটা শৈবালের (algae) মত দেখতে—৭/৮ইঞ্চি মাটি থেকে খাড়া হয়ে উঠেছে ও দু-চারটে শাখা বেরিয়েছে, কিন্তু পাতা তখন হয় নি। এই যুগেরই শেষের দিকে সত্যিকার ডালপালা ও পাতাওয়ালা গাছ ক্রমশ তৈরি হল। উদ্ভিদের খুব বেশি বিস্তার আসলে দেখা যায় কার্বনিফেরাস্ কয়লার যুগে। তখন পৃথিবীতে প্রাণীদের পক্ষে বেশ উপযোগী আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে। সেইজন্য উদ্ভিদের খুব উন্নতি এই সময় দেখা যায়। বড় বড় গাছের ঘন জঙ্গলে পৃথিবী আচ্ছন্ন হয়ে গেল। সেইসব জঙ্গল মাটি চাপা পড়ে কয়লার খনিতে পরে পরিণত হয়। কয়লার খনিমাত্রেই কার্বনিফেরাস্ যুগে তৈরি হয়েছে। কয়লা তৈরি হবার এমন সুযোগ আর কখনো হয় নি। উদ্ভিদের উন্নতির সঙ্গে জন্তুদেরও দ্রুত উন্নতি হতে লাগল। তারা প্রচুর খাবার পেল।

ডাঙার জন্তু সম্ভবত মাছ থেকে উৎপন্ন। জল যত শুকিয়ে যেতে

লাগল, মাছের চেষ্টা হল নিজেদের ডাঙায় থাকবার উপযোগী করে তুলতে। এখনও পর্যন্ত দু-চার রকম মাছ দেখতে পাওয়া যায় যারা উভচর। কইমাছ কানকোর সাহায্যে ডাঙার উপর দিয়ে চলে যেতে পারে। মাছের পাখনা ক্রমশ পায়ে পরিণত হল, আর অপরিণত ফুস্‌ফুস্‌ হাওয়ায় শ্বাসপ্রশ্বাস নেবার উপযুক্ত হয়ে উঠল। কয়লা-যুগের শেষে দেখা যায় মাছের এইভাবে ক্রমবিবর্তন হয়ে পুরোপুরি চতুষ্পদ জন্তু যথেষ্ট জন্মেছে। মাছ আমিষাশী ছিল, তাই চতুষ্পদ জন্তুরাও গোড়ায় আমিষাশী হল। সেই যুগের প্রচুর উদ্ভিদের তারা সদ্‌ব্যবহার করতে পারে নি। ওদের মধ্যে যারা তাড়াতাড়ি উদ্ভিজ্জাশী হতে পারল পরবর্তী যুগে তাদেরই দ্রুত উন্নতি দেখা যায়।

যে সব জন্তু এই সময় জন্মেছিল তার মধ্যে সরীসৃপ প্রধান। সরীসৃপের চরম উন্নতি হয়েছিল মেসোজোইক মহাযুগে। তারা তখন টিকটিকি, গিরগিটির মতো ছোটোখাটো জন্তু আর নয়, ডাইনোসর্‌ (Dinosaur), ডিপ্লোডকাস্‌ (Diplodocus), ইগুয়ানোডন্‌ (Iguanodon), আর্কিয়োপ্‌টেরিক্‌স্‌ (Archeopteryx), ইকটিওসর্‌ (Ichtyosaur) প্রভৃতি অতিকায় জন্তুর রূপ নিয়েছে। এই মহাযুগে এইসব বিশ্রী রকমের প্রকাণ্ড জন্তুজানোয়ার পৃথিবীতে একাধিপত্য করেছে।

পাখি জন্মাবার বহু পূর্ব থেকেই পোকাদের ডানা গজিয়েছিল। পাখির জন্ম জুরাসিক্‌ যুগে। গোড়ার দিকে তারা ঠিক উড়তে পারত না, অন্য জন্তুদের মত তাদের শরীর ভারি ছিল; গাছের উপর থেকে ডানা মেলে গ্লাইডারের মতো মাটিতে নেমে আসত। ক্রমশ শরীর হাল্কা হয়ে, ডানা বড় হয়ে তাদের ওড়বার শক্তি বাড়ল।

কয়লার যুগে গাছ যদিও প্রচুর ছিল, সপুষ্পক উদ্ভিদ প্রথম দেখা দিল ক্রিটেশ্যাস্ যুগে। গাছের ফুল হওয়াতে কীটপতঙ্গের খুব সুবিধা হল। মৌমাছি, প্রজাপতি প্রভৃতি নানান পোকামাকড় জন্মাতে লাগল। এদের এত প্রাদুর্ভাব তখন হয়েছিল যে একটা সমস্যা দাঁড়াল পৃথিবীতে কীটেরা রাজত্ব করবে না জন্তুরা। কীটেরা হার মেনে গেল তখনকার মত। কিন্তু ডাইনোসর্‌দের মত অতিবৃহৎ জন্তুদেরও একাধিপত্য বেশিদিন রইল না। স্তন্যপায়ী জন্তুরা আকারে অনেক ছোটো হলেও তাদের বুদ্ধির কাছে ক্ষুদ্রমগজ অতিকায় জানোয়ারেরা যুঝতে পারল না, ক্রিটেশ্যস্ যুগের শেষে তারা প্রায় লোপ পেয়ে গেছে। সেনোজোইক মহাযুগের গোড়ার দিকে সবচেয়ে বুদ্ধিমান জন্তু বাঁদরের জন্ম হল; বনমানুষ ও বাঁদর থেকেই আধুনিক প্লিস্টোসিন যুগে মানুষের আবির্ভাব। মানুষ সবচেয়ে আধুনিক জীব, তিন-চার লক্ষ বছর পূর্বে পৃথিবীতে মানুষ ছিল না।

জীবের ক্রমবিবর্তনের অতি সংক্ষেপে বিবৃত এই ইতিহাস বেশির ভাগ আমরা জানতে পেরেছি ফসিল থেকে। নানা যুগের ফসিল পরীক্ষা করে কালক্রমিক জীববৃত্তান্ত গড়ে তুলতে কোনো অসুবিধা হয় নি। এই ইতিবৃত্তান্তে মাঝে মাঝে যে ছেদ থেকে যায় নি তা নয়। ডারউইন সেগুলিকে হারানো সূত্র, মিসিং লিংক্‌স্ (missing links) বলতেন। ডারউইন যে প্রমাণগুলি পান নি যেগুলিকে মিসিং লিংক্‌স্ বলেই তিনি গণ্য করতে বাধ্য হয়েছিলেন, পরে তার অনেকগুলোই খুঁজে পাওয়া গেছে। তবে ধারাবাহিকভাবে সব প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নি, কিছু কিছু রয়ে গেছে, কিন্তু তাতে অভিব্যক্তির ক্রমিক ইতিহাস রচনা করবার বিশেষ বাধা হয় না।

দেহগঠন-তুলনামূলক প্রমাণ

এক জাতের জীব আর-এক জাতের জীবের মত দেখতে না হলেও তাদের মধ্যে নিকট সম্বন্ধ থাকতে পারে। যদি তাদের শরীরের গঠনে মিল থাকে তাহলে সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের হোলেও তাদের এক শ্রেণীভুক্ত বলা যায়। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাদৃশ্য সব সময়ে বাইরে থেকে প্রত্যক্ষ নয়। অঙ্গের ব্যবহার থেকেও ভিতরকার সাদৃশ্য ধরা যায় না। আরিস্টটল্ প্রথম এটা লক্ষ্য করেছিলেন। সেইজন্য তিমিমাছকে মাছের শ্রেণীভুক্ত না করে স্তন্যপায়ী চতুষ্পদের দলে ফেলেছিলেন। তিনি ঠিকই ধরেছিলেন। তিমিমাছের সত্যই চারটে পা আছে। তার পাখনা দুটো আসলে সামনের দুই পা। পিছনের পায়ের বাইরে কোনো চিহ্ন নেই, যেখানে পা থাকবার কথা সেখানকার মাংস কাটলে দেখা যায় ছোটো ছোটো দুটি পা শরীরের ভিতর লুকান রয়েছে। জলে থাকার দরুণ তিমিমাছের পা ক্রমশ লোপ পেয়ে গেছে বা অন্য কাজে ব্যবহার হচ্ছে। অভিব্যক্তির ফলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের এইরূপ অদ্ভুত পরিবর্তন বিচিত্র নয়। শরীরের গঠন ভাল করে তুলনা করে না দেখলে জীবজন্তুর পরস্পরের সম্বন্ধ ধরা যায় না। তিনটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা ভালো বোঝা যাবে—

(১) পাখির ডানা ও মানুষের হাত। এদের বাইরের সাদৃশ্য কিছুমাত্র নেই, ব্যবহারের দিক থেকেও কোনো মিল নেই—কিন্তু অঙ্গ হিসাবে এরা এক।

(২) পাখির ডানা ও প্রজাপতির ডানা — এরা দেখতে একই ধরনের কিন্তু গঠনপ্রণালী সম্পূর্ণ ভিন্ন, সত্যিকার কোনো যোগ নেই।

(৩) পাখির ডানা ও বাদুড়ের ডানা। এদের মধ্যে ব্যবহারিক সাদৃশ্য আছে, গঠনমূলক সাদৃশ্যও দেখতে পাওয়া যায়।

নানান জাতের জীবজন্তুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তুলনা করলে কোন্ জাতের কি ভাবে পরিবর্তন হয়েছে ধরা পড়ে। যদি ব্যাঙের পা, কচ্ছপের পা, পাখির ডানা, ঘোড়ার সামনের পা, তিমির পাখনা, বাদুড়ের ডানা ও মানুষের হাত তুলনা করা যায় তবে দেখা যাবে পূর্বোক্ত প্রত্যেক জন্তুর এই অঙ্গগুলির হাড়ের মাংসপেশির, এমন কি শিরা-উপশিরার গঠন ও সংস্থানের মধ্যে, খুব মিল আছে। কিন্তু অঙ্গগুলির বহিরাকৃতি ও ব্যবহার কত বিচিত্র! এর থেকে কি প্রমাণ হয় না যে এই জন্তুগুলির মধ্যে বংশগত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে?

১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত যাবতীয় জীবজন্তুর নামকরণ করে যে শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে প্র্যাট (Pratt) তার একটি হিসাব প্রস্তুত করেছেন। এই তালিকাটি দেখলে বোঝা যায় জীবলোকে কত বৈচিত্র্য—

জন্তু		উদ্ভিদ	
শ্রেণীর নাম	জাতির সংখ্যা	শ্রেণীর নাম	জাতির সংখ্যা
Arthropods	৬৪০,০০০	Angiosperm	১৫০,০০০
Mollusca	৭০,০০০	Fungi	৭০,০০০
Chordata	৬০,০০০	Mosses	১৫,০০০
Protozoa	১৫,০০০	Algae	১৪,০০০
Coleontarata	৯,৫০০	Pteridophytes	১০,০০০
Annelida	৬,৫০০	Liverworts	৬,০০০
Plathelminthes	৬,০০০	Bacteria	১,২০০

জন্তু		উদ্ভিদ	
Echinodermata	৪,৮০০	Gymnosperms	৫০০
All others	১০,৯৬৫		
	৮,২২,৭৬৫		২,৬৬,৭০০

দেখা যাচ্ছে পৃথিবীতে প্রায় এগারো লক্ষ জাতের জীবজন্তু আছে। তাদের শ্রেণীবিভাগ করা সোজা কথা নয়। তাদের দেহগঠন ভু করে শ্রেণীবিভাগ করতে হয়েছে। প্রচলিত বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিভাগে এই কয়েকটি সংজ্ঞা ব্যবহার করা হয়—ব্যক্তি (individual), উপজাতি (variety), জাতি (species), মহাজাতি (genera), বংশ (family), বর্গ (order), শ্রেণী (class)। এই ক্রম অনুযায়ী সাজালে প্রাণীদের পরস্পরের মধ্যে জ্ঞাতি-কুটুম্বিতার কতখানি যোগ তা ধরা পড়ে যায়। লিনিয়াস (Linneus, ১৭০৭-১৭৭৮) সব প্রথম এই ভাবে শ্রেণীবিভাগ করেছিলেন। সেই থেকে জীববিজ্ঞানীদের ধারাবাহিক চেষ্টার ফলে এগারো লক্ষ উদ্ভিদ ও জন্তুর নামকরণ ও বংশ-পরিচয় নির্ণয় করা হয়েছে। সেই শ্রেণীবিভাগ থেকে আমরা দেখতে পাই পৃথিবীতে কোনো একটি জাতিও খাপছাড়া ভাবে সৃষ্টি হয় নি, প্রত্যেক জাতির সঙ্গে অন্য জাতির কিছু না কিছু সম্বন্ধ আছে। এক জাতি যদি অন্য জাতি থেকে উৎপন্ন না হয়ে থাকে তবে তাদের পরস্পরের মধ্যে এইরকম সম্বন্ধ আসে কি করে? জীবজন্তুকে যে শ্রেণীবিভাগ করতে পারা যায় সেইটাই ক্রমবিবর্তনের একটি মস্ত বড় প্রমাণ।

ক্রমবিবর্তনের আর একটি বেশ ভালো প্রমাণ লুপ্তপ্রায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ (vestigial organs)। অধিকাংশ জন্তুর শরীরে দু-একটি লুপ্তপ্রায় অঙ্গ দেখা যায়। অপরিণত ও ব্যবহার নেই এ রকম অঙ্গের চিহ্ন মানুষ তার শরীরে বহুল পরিমাণে বহন করে। মানুষের লেজ এখন নেই কিন্তু মেরুদণ্ডের শেষভাগে একটুকরা হাড় দেখে বোঝা যায় এক সময় তার লেজ ছিল। তাহলে লেজওয়ালা জন্তুর সঙ্গে মানুষের নিশ্চিত সম্বন্ধ আছে। লুপ্তপ্রায় অঙ্গের উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে, তিমিমাছ বা সাপের পা ; মানুষের তৃতীয় চোখ, কান ঘোরাবার মাংসপেশী, অ্যাপেণ্ডিক্স্ ও লেজ ; গুহাবাসী অন্ধ জন্তুদের চোখ ; উড়তে পারে না এমন অনেক পোকার ডানা ; মনসা গাছের পাতা ইত্যাদি। ব্যবহার অভাবেই হোক বা অন্য যে-কোনো কারণেই হোক, এই অঙ্গগুলি লোপ পেলেও কিছু না কিছু চিহ্ন থেকে যায় শরীরে। ক্রমবিবর্তনের ফলেই এইসব অঙ্গ লোপ পেতে বসেছে মেনে নেওয়া ছাড়া অন্য কোনো যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না।

ভ্রূণগঠন-তুলনামূলক প্রমাণ

মাতৃগর্ভে জন্তুরা যতদিন ভ্রূণ অবস্থায় থাকে তাদের জাতিবৈশিষ্ট্য ধরা যায় না, প্রথমাবস্থায় সব ভ্রূণই প্রায় একরকম দেখতে। এই সাদৃশ্য প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন ভ্রূণতত্ত্ববিৎ ফন্ বেয়ার (Von Baer, ১৭৯২-১৮৭৬)। ল্যাবরেটরিতে নিয়ে ভালো করে পরীক্ষা করবেন বলে তিনি একসময় নানা জন্তুজানোয়ারের ভ্রূণ কয়েকটা স্পিরিটের বোতলে ভরে রেখেছিলেন। ঘটনাক্রমে বোতলের লেব্‌লগুলি উঠে যায়। তাঁর মতো বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিও তখন স্থির করতে পারেন নি কোন্‌টি গিরগিটির, কোন্‌টি পাখির, বা কোন্‌টি স্তন্যপায়ী চতুষ্পদ কোনো জন্তুর ভ্রূণ।

জাতিনির্বিশেষে ভ্রূণের এই যে সাধারণ সাদৃশ্য তা ক্রমবিবর্তনেরই সাক্ষ্য দেয়। জীববিশেষের মাতৃগর্ভে পুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূণের যে পরিণতি বা পরিবর্তন ঘটতে থাকে তার মধ্যে ঐ জীবের জাতীয় ক্রমবিবর্তনের সাংকেতিক সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়। প্রথমাবস্থায় সে কোন্‌জাতীয় তা একেবারেই বোঝা যায় না। ক্রমশ তার বংশ-সাদৃশ্য প্রকাশ পায়; প্রসবকালের অনতিপূর্বে তবে সে তার পিতৃমাতৃকুলের রূপ গ্রহণ করে। তার নিজস্ব প্রকৃতি শেষের দিকে ফুটিয়ে তোলে, গোড়ার অবস্থায় সে তার বংশের পরিচয় দেয় মাত্র। মানুষের ভ্রূণ পরীক্ষা করলে দেখতে পাব তার হৃদ্‌যন্ত্র প্রথমাবস্থায় মাছের মত, স্তন্যপায়ী জন্তুর মত তখনও তা দুভাগে বিভক্ত হয় নি; মাছের কানের ভিতর যেমন ফুকোর বা gill-slits থাকে তার ঘাড়ের দুপাশে সেই রকম কতকগুলি গর্ত পাশাপাশি রয়েছে ও মোটের উপর তার শরীরের গঠন অনেকটা মাছেরই মতন। অন্য স্তন্যপায়ী জন্তুর ভ্রূণেও ঠিক এইরকম দেখা যায়। এর থেকে কি প্রমাণ হয় না ডাঙার জন্তুরা আদিম অবস্থায় জলচর জীব ছিল?

ভৌগোলিক প্রমাণ

পৃথিবীর ভৌগোলিক অবস্থার নানারকম বদল হয়েছে যুগের পর যুগে। এক সময় সমস্তটাই ছিল জল, স্থল জাগতে সময় নিয়েছিল। জমি তৈরি হল বটে কিন্তু কায়েমি হল না। অনেক মহাদেশ বহুবার সমুদ্রতলায় নিমজ্জিত হয়েছে, আবার জেগে উঠেছে। এখন পৃথিবী অনেকটা স্থিতিশীল, কিন্তু পূর্বে তা ছিল না। নানারকম ভাঙাচোরার পর তবে গড়ে উঠেছে। এখনকার ভূগোলের সঙ্গে গত

মহাযুগের ভূগোলের অনেক পার্থক্য। থেকে থেকে ভূগোলের এই যে ওলটপালট ঘটেছিল ভূচর প্রাণীদের জীবনপ্রবাহের উপর তার কি কোনো প্রভাব থেকে যায় নি?

দেখা যায় পৃথিবীর এক-এক অঞ্চলে এক-এক রকমের জীবজন্তু মেলে। কেবল আফ্রিকাতেই জেব্‌রা পাওয়া যায়, অস্ট্রেলিয়ায় ক্যাঙ্গারু, তিব্বতে চমর। কেবল তাই নয়, ডারউইন্‌ লক্ষ্য করেছিলেন, এক দেশের জীবশ্রেণীর সঙ্গে অন্য দেশের জীবশ্রেণীর যথেষ্ট তফাত, একটি দুটি বিশিষ্ট জাতি বলে নয়, সমস্ত জীবজন্তুই বেশ ভিন্ন প্রকৃতির। স্থানবিশেষে জীবশ্রেণীর এইরকম বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে কি করে? বিশেষ দেশের বিশেষ আবহাওয়ার গুণেই যে এইরকম হয় তা সম্পূর্ণ সত্য নয়। কারণ এক দেশের গাছ বা জন্তু অন্য দেশে গিয়ে বেশ স্ফূর্তিতে আছে প্রায়ই দেখা যায়। এমন কি অনেক সময় দেখা গেছে নতুন জায়গায় গিয়ে বেশি করে বাড়ে। কাজেই কেবল আবহাওয়ার বদলে যে জীবজন্তুর বৈশিষ্ট্য বিকাশ পায় তা ঠিক নয়। ডারউইন্‌ প্রশান্ত মহাসাগরের গ্যালাপেগস্‌ (Galapagos) দ্বীপপুঞ্জে গিয়েছিলেন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে। সেখানকার উদ্ভিদ ও প্রাণিকুলের যে বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলেন তাতে তাঁকে বেশ ভাবিয়ে দিল। এই বৈশিষ্ট্যের কারণ আবিষ্কার করতে গিয়ে অভিব্যক্তির সপক্ষে যে সব প্রমাণ পেতে লাগলেন তার থেকেই তিনি তাঁর প্রাকৃতিক নির্বাচনের মতবাদ খাড়া করে তোলেন। তিনি বুঝলেন পৃথিবীর ইতিহাসের সঙ্গে জীবের ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অধিকাংশ মহাদেশগুলি এখন যেমন পরস্পর যুক্ত, পুরাকালে তা ছিল না। তারা বিচ্ছিন্ন ছিল এক একটি মহাদ্বীপের মতো, যেমন এখন অস্ট্রেলিয়া। চারদিকে সমুদ্রে ঘেরা ছিল বলে এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে জীবজন্তুদের চলাচল সম্ভব হত না। সেইজন্য

বিভিন্ন মহাদেশের জীবশ্রেণীর ক্রমবিকাশ বিভিন্ন ধারায় অগ্রসর হয়েছে। যে-সব দেশ উঁচু পর্বতশ্রেণী দিয়ে ঘেরা, যেমন তিব্বত, অথবা সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপ বা দ্বীপপুঞ্জ, যেমন গ্যালাপেগস্—সে-সব দেশের জীবজন্তুদেরও ক্রমবিবর্তন স্বতন্ত্রভাবে হয়েছে। পৃথিবীর জীবকুল ক্রমবিবর্তনের ফলে বৈচিত্র্য লাভ করেছে, এবং ক্রমবিবর্তনের ফলেই বিভিন্ন প্রদেশে তাদের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে, আমাদের স্বীকার না করে উপায় নেই।

মানুষের অভিব্যক্তি

পৃথিবীতে কোন্ সময়ে কি করে মানুষের আবির্ভাব হল জানবার কৌতূহল আমাদের সকলেরই বোধ হয় আছে। তা ছাড়া বানর থেকে নরের উৎপত্তি যে-শাস্ত্রে বলে তার প্রতি আমাদের রাগ হওয়া স্বাভাবিক। সেইজন্য এ বিষয়ে যতটা জানতে পারা গেছে তা পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত করা প্রয়োজন। বিজ্ঞান কারো খাতির করে না, বানর থেকে মানুষের উৎপত্তির যদি সত্যই যথার্থ প্রমাণ থাকে তবে কারো অহংকারে ঘা লাগবে বলে বিজ্ঞান চুপ করে থাকবে না। তবে বলে রাখা উচিত অভিব্যক্তি বোঝাতে গিয়ে মানুষের উদাহরণ দেওয়াটা ভালো নয়। অন্য অনেক জাতির উৎপত্তির উদাহরণ দিয়ে অভিব্যক্তির ধারা বেশ সুস্পষ্ট বোঝানো যেতে পারত, তাদের ধারাবাহিক ইতিহাসের ঢের বেশি মাল-মশলা সংগ্রহ করা হয়েছে। মানুষের পূর্বপুরুষের স্মারকচিহ্ন খুব কমই পাওয়া গিয়েছে। মানুষের চেয়ে ঘোড়া বা হাতির বংশ-পরিচয় আমরা অনেক বেশি জানি।

ডারউইন সহজেই লক্ষ্য করেছিলেন, জন্তুদের মধ্যে বাঁদর ও বন-মানুষের সবচেয়ে বেশি বুদ্ধি, তাদের শরীরের গঠন এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের

বিন্যাস ও ব্যবহার মানুষেরই মতন। তার থেকে তিনি অনুমান করেছিলেন যে এই দুই জাতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। তাঁর অনুমানের সপক্ষে দু-চারটে ফসিল বেরোতে লাগল যাতে তাঁর এই ধারণাকে দৃঢ়তর করে দিল। কিন্তু বাঁদর আর মানুষের মাঝামাঝি এমন কোনো ফসিল পেলেন না, যাতে মানুষের বংশক্রম সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায়। তাঁর জীবদ্দশায় এই একটি মস্ত বড় 'মিসিং লিংক্' থেকে গিয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পর তার সন্ধান পাওয়া গেছে। মানুষের পূর্বপুরুষের যে কয় রকম ফসিল এপর্যন্ত পাওয়া গেছে তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে—

(১) পিল্‌টডাউন ম্যান (Piltdown Man)— ইংলণ্ডে আবিষ্কৃত ফসিল মানুষ। বনমানুষের মতো তার ভারি চোয়াল; দাঁত ও চোখের গহ্বর থেকে বোঝা যায় হিংস্রপ্রকৃতির; পাথরের হাতিয়ার ব্যবহার করতে শিখেছে।

(২) পিথিকেনথ্রোপাস্ ম্যান (Pithecanthropus Man)— ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে জবদ্বীপে আবিষ্কৃত। মাথার খুলি থেকে মনে হয় গরিলা ও মানুষের মাঝামাঝি ওজনের ব্রেন ছিল। দেহও ছিল গরিলার মতো, কিন্তু মানুষের মতো দুপায়ে চলা ফেরা করত।

(৩) সিনেনথ্রোপাস্ ম্যান (Sinanthropus Man)—চীনদেশে ১৯২৮-২৯ খ্রীস্টাব্দে প্রাপ্ত কয়েকটি ফসিল। মাথা পিথিকেনথ্রোপাস্‌এর কাছাকাছি, তবে আর-এক ধাপ এগিয়ে আধুনিক মানুষ ঘেঁসা। তখনো কিন্তু কোনো হাতিয়ার ব্যবহার করতে শেখে নি।

(৪) হাইডেলবার্গ ম্যান (Heidelberg Man)—জর্মানিতে পাওয়া যায়। থুতনি হয় নি, চোয়াল চওড়া ও মোটা।

(৫) রোডেশিয়ান ম্যান (Rhodesian Man)—আফ্রিকায় আবিষ্কৃত। চোখের কোটর গভীর, উঁচু মোটা ভ্রূ, ব্রেন আধুনিক মানুষের অপেক্ষা ওজনে কিছু কম।

(৬) নিয়েনডারথ্যাল ম্যান (Neanderthal Man)—এই জাতের মানুষের বিস্তর ফসিল পাওয়া গেছে। এরা মৃতদেহ পুঁতে রাখত, তাই তাদের কঙ্কাল তত নষ্ট হয় নি। এরা আধুনিক মানুষের অনেকটা কাছাকাছি হলেও তখনও তাদের থুতনি হয় নি, চোয়াল মোটা রয়েছে, পা যথেষ্ট লম্বা নয় বলে হাঁটু বেঁকিয়ে চলে। এদের হাতে অসম্ভব জোর ছিল, কেননা যে-রকম ভারি পাথরের অস্ত্র ব্যবহার করত এখনকার মানুষ তা ব্যবহার করতে পারবে না। চেহারা বনমানুষ ও মানুষের মাঝামাঝি।

উল্লিখিত ফসিল মাত্রই প্লিস্টসিন যুগের। কেবল পিলটডাউন ম্যান হয়তো প্লিয়োসিন যুগেরও হতে পারে। তৎপূর্বকার মিয়োসিন যুগের একটিমাত্র যে জাতের কঙ্কাল পাওয়া গেছে সেটা বাঁদরেরই বলা উচিত, তবে দাঁত দেখে মনে হয় অনেকটা মানুষের মতো তাদের চেহারা ছিল। সেই মানুষসদৃশ বাঁদরজাতির নাম দেওয়া হয়েছে ড্রায়োপিথিকাস্ (Dryopithecus)।

মানুষের ফসিল বেশি পাওয়া যায় নি কিন্তু যে কয়টির কথা বলা হল তার থেকে মানুষের অভিব্যক্তি কি করে হয়েছে স্পষ্টই বোঝা যায়। আমরা যদি মিয়োসিন যুগের দিকে ফিরে তাকিয়ে দেখি তবে দেখব যতই সেই দিকে পিছিয়ে যাওয়া যায় মানুষ ততই বাঁদর বা বা বনমানুষের মতো হয়ে যাচ্ছে। আর যদি পুরাকাল থেকে আধুনিক কালের দিকে অগ্রসর হই তা হলে একদল বাঁদর ও বনমানুষকে ক্রমশ

মানুষের মতো হতে দেখি। বাঁদর, বনমানুষ ও মানুষের মধ্যে কি তবে যোগ নেই? কিন্তু, ঠিক যে বাঁদর বা বনমানুষ থেকে সোজাসুজি মানুষের উৎপত্তি হয়েছে তা নয়, এই তিন জাতিরই পূর্বপুরুষ সম্ভবত এক ছিল। বাঁদর, বনমানুষ ও মানুষ এক পূর্বপুরুষের তিনটি পৃথক শাখাবংশ।

ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদ

পূর্ব পরিচ্ছেদে আমরা জেনেছি আদিমকাল থেকে আজ পর্যন্ত ক্রমাগত পরিবর্তন হয়ে এসেছে জীবজগতের। ক্রমবিবর্তন কি করে হয়েছে, তার কারণ কী, প্রণালী কী, এ বিষয়ে বিজ্ঞানীরা আমাদের কতটা কী বলতে পারেন এখনো আমাদের জানবার বাকি আছে। এ বিষয়ে যত বৈজ্ঞানিক মতবাদ আছে তার মধ্যে ডারউইনের মতামতের সর্বপ্রধান স্থান। বিজ্ঞানীরা তাঁরই মতবাদকে এক কথায় ডারউই-নিজ্‌মকে (Darwinism) মোটামুটি গ্রহণ করেছেন। বিবর্তবাদ সম্বন্ধে ডারউইন কি বলেন প্রথমত তাই দেখা যাক, অন্যদের মতবাদ ও ডারউইনিজ্‌মের বিরুদ্ধে তর্ক যুক্তি সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাবে।

ডারউইনের পূর্বেও অনেক বিজ্ঞানী ক্রমবিবর্তনের কারণ ও তার প্রণালী বোঝাবার চেষ্টা করে নানান মতবাদ প্রচার করেছিলেন। ডারউইন তাঁদের কাছে যথেষ্ট ঋণী। কিন্তু ডারউইনের মহত্ত্ব হচ্ছে তিনি কোনো বিষয় অনুমানের উপর নির্ভর করেন নি। এইজন্যই ডারউই-নিজ্‌মকে এখনো পর্যন্ত কেউ সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিতে সক্ষম হয় নি। ক্রম-বিবর্তন সম্পর্কে তিনি যত তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন তা আর কেউ কখনো করে নি। গাছপালা, পোকামাকড়, জীবজন্তু—প্রাণীমাত্রের জীবনযাত্রার কোনো ঘটনাই তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। প্রাণীজগতের সমস্ত খবর তিনি জানতে চেষ্টা করেছিলেন। জানা কেবল নয়, তাঁর বিপুল জ্ঞানভাণ্ডার নিপুণ শৃঙ্খলার সঙ্গে সাজিয়ে রেখেছিলেন। সাজানো

হলে তাঁর অসামান্য বিচারবুদ্ধির সাহায্যে বিচিত্র ঘটনার মধ্যে কার্যকারণসম্বন্ধ আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছিলেন। একই মানুষের মধ্যে প্রখর দৃষ্টিশক্তি ও সূক্ষ্মবিচারবুদ্ধির এমন উৎকর্ষ প্রায় দেখা যায় না।

ডারউইন ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে 'Origin of Species by means of Natural Selection' বইতে প্রাকৃতিক নির্বাচনের সাহায্যে জীবজাতি সমূহের উৎপত্তি সম্বন্ধে তাঁর মতবাদ পুস্তক আকারে প্রথম প্রকাশ করেন। তাঁর আর দুই প্রসিদ্ধ বই পরে প্রকাশিত হয়েছিল। তাদের নাম 'Variation of Animals and Plants under Domestication' (১৮৬৭) ও 'Descent of Man' (১৮৭১)। এই তিনখানি বইয়ের মধ্যে ক্রমবিবর্তন সম্বন্ধে [illegible] বাদ তিনি আমাদের দিয়ে গেছেন। তিনটি প্রাকৃতিক ঘটনার উপর ডারউইনিজ্‌ম-এর ভিত্তি। সেই ঘটনাগুলি কী, ও কোন্ ঘটনা থেকে ডারউইন কী সিদ্ধান্ত করলেন তা সংক্ষেপে নিচে দেওয়া যাচ্ছে—

প্রথম প্রাকৃতিক তথ্য—জীবের ধর্মই হ'ল প্রজননের দ্বারা সংখ্যা বৃদ্ধি করা। দুই থেকে চার, চার থেকে আট, এই জ্যামিতিক গুণোত্তর শ্রেণী অনুপাতে জীবসংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি হতে চায়।

দ্বিতীয় প্রাকৃতিক তথ্য—এইভাবে দ্রুত-সংখ্যা-বৃদ্ধির প্রবণতা থাকা সত্ত্বেও আসলে জীবের সংখ্যাবৃদ্ধি তেমন দেখা যায় না। পৃথিবীতে উদ্ভিদ বা জন্তুর প্রত্যেক জাতির মোট সংখ্যা প্রায় স্থিরই থাকে দেখা গেছে।

প্রথম সিদ্ধান্ত—ক্রমাগত বংশবৃদ্ধি হচ্ছে অথচ মোট গণসংখ্যা বাড়ছে

না, এর থেকে নিশ্চয় বুঝতে হবে যে খাদ্যের জন্য ব্যষ্টিগত প্রতিযোগিতা অথবা পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে যোঝাযুঝির ফলে অনেকের মৃত্যু হয় সেইজন্য মোট সংখ্যা গণনানুযায়ী বাড়তে পারে না। এই অনুমানকে সত্তারক্ষার জন্য জীবনসংগ্রাম (Struggle for Existence) বলা যেতে পারে।

তৃতীয় প্রাকৃতিক তথ্য—ব্যষ্টিতে ব্যষ্টিতে ভেদ দেখা যায়। কোনো জীব আর একটি জীবের হুবহু নকল নয়। এক পিতামাতার সন্তানদের মধ্যেও যথেষ্ট পার্থক্য থাকে।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত—পূর্বে অনুমান করা হয়েছে প্রকৃতিতে অস্তিত্ব রক্ষার জন্য জীবনসংগ্রাম চলে। আর তথ্যের দিক থেকে দেখতে পাই জনে জনে ভেদ রয়েছে। তাহলে এই দুটো থেকে আর একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি—সেই ব্যক্তিরাই বেঁচে থাকে যারা কোনো বৈশিষ্ট্য-বশত জীবনসংগ্রামে অধিক যোগ্য। সকলে যখন সমান নয়, যাদের যোগ্যতা বেশি তারাই জয়ী হয় ও তাদেরই উত্তরোত্তর বংশবৃদ্ধি হতে থাকে। এই অনুমানকে ডারউইন যোগ্যতমের উদ্বর্তন বা প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural Selection) বলেছেন।

ডারউনিজ্‌ম্‌-এর উপরোক্ত প্রথম সিদ্ধান্তটি সকলেরই জানা কথা—বিশেষ প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। এ বিষয়ে ডারউইনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন ম্যালথস্‌। তিনি কেবল মানুষেরই দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধি সম্বন্ধে আলোচনা তুলেছিলেন, মানুষ যে রকম বেড়ে চলেছে তাতে খাবারের অভাব হয়ে দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও যুদ্ধবিগ্রহ অবশ্যম্ভাবী—এই তাঁর ভয় হয়েছিল। কিন্তু ডারউইন দেখলেন মানুষ কেবল নয়, জীবমাত্রই জ্যামিতিক গুণোত্তর শ্রেণীর নিয়মে ক্রমাগত বেড়ে যেতে চায়। প্রকৃতিতে সংখ্যাবৃদ্ধির কী প্রচুর আয়োজন তার উদাহরণ চতুর্দিকে। পেঁপে গাছ

গাছ হিসাবে নগণ্য কিন্তু এক-একটি গাছে কত ফল ধরে আমরা দেখেছি। তার প্রত্যেকটি ফলের ভিতর অনেক বীজ থাকে তাও দেখেছি —যদি সব বীজগুলি গুনে ফেলতে পারি তবে হয় তো দেখব প্রত্যেক গাছে বিশ-ত্রিশ হাজার বা ততোধিক বীজ জন্মায়। তবে প্রত্যেক বীজ যদি বড় গাছ হয়ে উঠত তবে কী অবস্থা হ'ত? দু-এক বছরের মধ্যে পেঁপে গাছেরই এত ঘন জঙ্গল হয়ে পড়ত যে এদেশে অন্য গাছ বা জীব-জন্তু বা মানুষের বাস করার স্থান থাকত না। এ বিষয়ে ডারউইন বেশ একটি উদাহরণ দিয়েছেন। হাতির খুব অল্পই বাচ্চা হয়, তার পরমায়ু আন্দাজ* একশ বছর। তাদের ত্রিশ বছর বয়স না হলে বাচ্চা হয় না। ত্রিশ থেকে নব্বই—এই ষাট বছরের মধ্যে গড়ে ছটি মাত্র বাচ্চা জন্মায়। যদি প্রত্যেকটি বাচ্চা বেঁচে বড় হতে পারত তবে ৭৫০ বছরের মধ্যে মাত্র একজোড়া হাতির ১৯,০০০,০০০ বংশধর জন্মাত। এক-জোড়া কেন অনেকজোড়া হাতিই ছিল ৭৫০ বছর পূর্বে, কিন্তু কই তাদের তো এই হিসাবমত বংশবৃদ্ধি হয় নি? বরং হাতি এখন এতই বিরল হয়ে পড়েছে যে মানুষ তাদের রক্ষা না করলে পৃথিবী থেকে বোধ হয় একেবারেই লোপ পেত এতদিনে।

দুটি মাত্র উদাহরণ দেওয়া হ'ল কিন্তু মনে রাখতে হবে সব জীবই ক্রমাগত বংশবৃদ্ধি করতে চায়। ব্যাক্‌টিরিয়া, অ্যামিবা প্রভৃতি জীবাণু কী দ্রুত বেড়ে যেতে পারে তা ডাক্তাররা ভালো করেই জানেন। কিন্তু বংশবৃদ্ধির দ্রুত বা মন্দ গতির তারতম্যে বিশেষ কিছু আসে যায় না, যে-কোনো প্রাণী যদি অবাধে বাড়তে পারে তবে সে তার একার সন্তানসন্ততির দ্বারা অতি অল্প সময়েই পৃথিবী আচ্ছন্ন করে ফেলতে পারে। কারো লাগবে কয়েকদিন মাত্র, কারো বা কয়েক বছর। কিন্তু আসল কথা

হচ্ছে জীবের ধর্মই হ'ল বৃদ্ধি। প্রত্যেক জীবের সঙ্গে অন্য জীবের যেন রেষারেষি চলছে কে কত দ্রুত নিজের বংশবৃদ্ধি করতে পারে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে একটি ব্যাকটিরিয়া নিজেকে দুভাগ করে ফেলছে, একটি গাছে প্রত্যেক বছর অসংখ্য বীজ উৎপন্ন হচ্ছে, একটি মাত্র পিঁপড়ে বা মৌমাছির রানী লক্ষ লক্ষ ডিম পাড়ছে। কিন্তু এইসব জাতির মোট গণসংখ্যা কি এই হিসাবে আমরা বাড়তে দেখি? তাহলে বোঝা যাচ্ছে বড় হবার আগেই অনেক মরে যায়।

ডারউইন দেখিয়েছেন বংশবৃদ্ধির এত ঐকান্তিক চেষ্টা সত্ত্বেও পৃথিবীতে জীবসংখ্যা পরিমিত, মোটের উপর সেই সংখ্যার কমতি-বাড়তি বেশি হয় না। তবে কোনো বিশেষ সুবিধা পেয়ে কোনো বিশেষ জাতি কোনো জায়গায় হঠাৎ খুব বেড়ে যেতে পারে। মানুষ অনেক সময় কোনো কোনো জীবকে বাড়বার এই রকম বিশেষ সুযোগ দিয়ে থাকে। তখন বোঝা যায় একটু সুবিধা পেলেই কত শীঘ্র তারা বাড়তে পারে, তাদের বংশবৃদ্ধির কী অসীম ক্ষমতা। বাংলা দেশে বিদেশ থেকে আনা কচুরিপানা এর একটি চমৎকার উদাহরণ। বিশেষ কারণে বিশেষ স্থানে মাঝে মাঝে প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম হলেও সমস্ত পৃথিবী যদি ধরা যায় তবে দেখা যাবে জীবজন্তু গাছপালার মোট সংখ্যা একরকম সমভাবেই আছে। এর কারণ কি? পুরুষানুক্রমে গণসংখ্যা সমান থাকতে পারে একটিমাত্র উপায়ে—গড়পড়তায় যদি দুটিমাত্র সন্তান বেঁচে থাকে। প্রত্যেক পিতামাতার স্থান নেবার জন্য কেবল দুটি সন্তান হলেই চলে। তার বেশি বেঁচে থাকলে মোট গণসংখ্যা বেড়ে যেতে থাকবে।

কিন্তু দুটি কেন, সন্তান তো অনেক বেশি জন্মায়। অন্যদের

কী হয় ? তারা নিশ্চয়ই মরে যায়। জন্মাবার পূর্বেই মাতার গর্ভে কিছু নষ্ট হয়, জন্মাবার পর শিশু অবস্থায় অধিকাংশ মরে যায়, বড় হয়েও সকলে বাঁচে না। গাছের তলায় অসংখ্য চারা জন্মায়। হাওয়া, আলো, খাবার নিয়ে তাদের মধ্যে কী ভয়ানক টানাটানিই না চলতে থাকে। সেই অসংখ্য চারার মধ্যে ক'টাই বা বড় গাছ হতে পায় ? জীবিকার উপাদান অপরিমিত নয়, তাই বেঁচে থাকার জন্য সকলকেই যুঝতে হয় অন্যদের সঙ্গে। কাড়াকাড়ি, মারামারি, খাওয়াখাওয়ি নিয়ত চলেছে জীবজগতে। খাবারের অভাব তো আছেই, তার উপর রোগ-মহামারীর হাত থেকেও প্রাণরক্ষা করতে হয়। স্বজাতির মধ্যে প্রতিযোগিতা সবচেয়ে প্রবল। যারা একজাতীয় তারা একই রকম পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে বাস করে, তাদের একই রকম খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজন হয়, একই ধরনের রোগে তারা আক্রান্ত হয়। আর, ব্যক্তিগত ভাবে দেখতে গেলে জীবনের প্রারম্ভেই সর্বাপেক্ষা কঠোর প্রতিযোগিতা। শিশু জন্মাবার পূর্বেই ভ্রূণ বা বীজ অবস্থায় অনেকটা নির্বাচন হয়ে যায়। তারপর শিশুহত্যার পালা। ঘেঁষাঘেঁষির মধ্যে থাকা, খাদ্যের অভাব, শত্রুপক্ষের বা রোগের আক্রমণ প্রভৃতি নানান অসুবিধা ও অত্যাচার সহ্য না করতে পেরে অধিকাংশ জীবের শিশু অবস্থাতেই অকালমৃত্যু অনিবার্য। একদিকে যেমন বংশবৃদ্ধির জন্য প্রচুর আয়োজন অন্যদিকে জীবন-ধারণের বিরুদ্ধে তেমনি প্রবল সব বাধা। প্রাণধারণের জন্য এই যে জাতিগত ও ব্যক্তিগত প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা একেই ডারউইন অস্তিত্বরক্ষার জন্য জীবনসংগ্রাম (Struggle for Existence) বলেছেন।

বংশবৃদ্ধির চেষ্টা জীবের একটি প্রধান গুণ। ডারউইন সেইসঙ্গে লক্ষ্য করলেন জীবের আর একটি সাধারণ লক্ষণ যাকে প্রকারণ বা ব্যক্তিগত প্রকারভেদ বলা যেতে পারে (তৃতীয় প্রাকৃতিক তথ্য)। কেউ কারো অনুরূপ নয়; একই জাতের মধ্যে, একই পরিবারের মধ্যে, একই পিতামাতার সন্তানদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। ব্যক্তিগত পার্থক্য বেশিমাত্রায় প্রকাশ পেলেই তখন জাতি-ভেদে গিয়ে দাঁড়ায়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অধিকাংশ সময় এত সামান্য যে সহজে চোখে ধরা পড়ে না। একমুঠো ধান হাতে নিলে তার প্রত্যেক বীজটা আমাদের সাদা চোখে একই রকম মনে হবে। কিন্তু বিজ্ঞানীদের চোখে ছোটখাট অনেক পার্থক্য ধরা পড়বে। ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে এই যে অল্পবিস্তর প্রকারভেদ একে প্রকারণ বলা যেতে পারে, ডারউইন যাকে ভেরিয়েশন্ (Variation) বলেছেন।

জীবজগতে তাহলে আমরা দুটি প্রাকৃতিক সত্য লক্ষ্য করলুম— (১) বংশবৃদ্ধির প্রচুর ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও মোট গণসংখ্যা বাড়ে না; (২) কেউ কারো ছাঁচে গড়া নয়, ব্যক্তিমাত্রেরই কিছু না কিছু স্বাতন্ত্র্য আছে। এই দুটি তথ্য সত্য হলে এর ফল কি দাঁড়ায় এখন দেখা যাক। যে ব্যক্তির শারীরিক শক্তি বা বুদ্ধি একটু বেশি, প্রতিযোগিতায় তারই জয়ী হবার সম্ভাবনা বেশি। যে প্রকারণগুলি ব্যক্তিবিশেষকে জীবনসংগ্রামে অধিকতর যোগ্যতা দান করে সেইগুলোই টিঁকে যায়। যে হরিণের পা একটু বেশি লম্বা সে অন্যদের চেয়ে বাঘের কবল থেকে সহজে নিজের প্রাণরক্ষা করতে পারে। যে বাঘের গায়ে ভাল ছোপ আছে সে শিকার ধরবার জন্য ঝোপঝাপের মধ্যে সহজে লুকিয়ে থাকতে পারে।

প্রকারণগুলি খুব সামান্যভাবে প্রকাশ পায় বটে কিন্তু সেগুলি বংশানুগত চলতে থাকে—অন্তত ডারউইন তা মনে করতেন। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে যোঝবার জন্য জীববিশেষকে কোনো একটি প্রকারণ যদি সামান্য সুবিধাও দেয় তবে পুরুষানুক্রমে সেই প্রকারণ ক্রমশঃ বেশি করে ফুটে ওঠে। অন্যদিকে যে প্রকারণগুলি বাধা দেয় সেগুলি শীঘ্র লোপ পায়। কারণ, অসহায়ক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে কোনো জীব অন্য জীবের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় যুঝতে পারে না। তারা বংশবৃদ্ধি করার সুযোগ পায় না। সহায়ক প্রকারণের ক্রমোন্নতি ও অসহায়ক প্রকারণের আশুবিলোপ একেই সংক্ষেপে যোগ্যতমের উদ্বর্তন (Survival of the Fittest) বলা যায়। অন্য কথায় তাকে প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural Selection) বলতে পারি। প্রকৃতি ক্রমাগতই যোগ্যদের বাঁচিয়ে রাখছে, তাদেরই বংশবৃদ্ধির সুবিধা করে দিচ্ছে, কাজেই অযোগ্য থেকে যোগ্যের, যোগ্যতর থেকে যোগ্যতমের ক্রম-নির্বাচন চলছে এটা ধরে নিতে পারি (দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত)।

আবার বাঘ-হরিণের উদাহরণ নেওয়া যাক। ধরা যাক, কোনো এক জঙ্গলে বাঘের প্রাদুর্ভাব হয়েছে। কোনো বিশেষ সুযোগ পাওয়াতে বাঘের সংখ্যা সেখানে বেড়ে গেছে। হরিণ ও বাঘের খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ, কাজেই হরিণদের বিপদ উপস্থিত। কিছুদিনের মধ্যে হয়তো দেখা যাবে হরিণ প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেছে সেই জঙ্গলে। কয়েকটি মাত্র যারা বেঁচে গেছে তাদের হয় বুদ্ধি বেশি, নয়তো দৌড়তে পারে বেশি—বাঘ তাদের ধরতে পারে নি। এই কয়েকটি হরিণদের বাচ্চারা যখন বড় হবে, তাদের মধ্যে ঠিক এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে। তাদের মধ্যে যারা বুদ্ধিমান বা যাদের

পা বেশি লম্বা বলে দ্রুত দৌড়তে পারে তারাই বেঁচে থাকবে। কয়েক পুরুষ ধরে যদি এইরকম নির্বাচন চলতে থাকে তবে সজাগ সতর্কতা (alertness) ও দৌড়বার অদ্ভুত ক্ষমতা হরিণের জাতিগত বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়াবে।

প্রাকৃতিক নির্বাচনের যে প্রণালীর কথা বলা হ'ল তা ছাড়াও আর এক উপায়ে নির্বাচন হয়ে থাকে। স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ থেকে তার উৎপত্তি। শ্রেণীবিশেষে মেয়েরা পুরুষদের আকৃষ্ট করবার চেষ্টা করে কিন্তু সাধারণত বেশির ভাগ জীবজন্তুর মধ্যে পুরুষরাই সঙ্গিনী খুঁজে বেড়ায়। পুরুষদের মধ্যে এই নিয়ে প্রতিযোগিতা হওয়া স্বাভাবিক। যে পুরুষদের মেয়েরা বেশি পছন্দ করে, অথবা যাদের শারীরিক ক্ষমতা বেশি তারাই সহজে সঙ্গিনী জোটাতে পারে। এই যৌন প্রতিযোগিতায় যারা হেরে যায় তাদের মৃত্যু হয় না অবশ্য, কিন্তু তারা নিজেদের বংশ রক্ষা করতে পারে না। ময়ূরীদের চিত্তাকর্ষণ করবার জন্য ময়ূরের গায়ে কী চমৎকার বর্ণচ্ছটা, পেখম মেলে ঘুরে ফিরে তার সৌন্দর্য দেখাবার জন্য সে কত চেষ্টা করে আমরা দেখতে পাই। সারস জাতীয় পাখীদের পুরুষরা নাচে মেয়েদের মুগ্ধ করার জন্য। মানুষের মধ্যে নৃত্যকলার উৎপত্তি কি এই আদিম প্রেরণা থেকে নয়? ডারউইন মনে করেন স্ত্রী-পুরুষের আকর্ষণঘটিত প্রাকৃতিক নির্বাচন (Sexual Selection) অভিব্যক্তির যথেষ্ট সাহায্য করে।

যেসব কারণ থেকে ক্রমবিবর্তন ঘটে তার কোনোটাই দ্রুত কার্যকর নয়। প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রণালী স্বভাবতই সময়-সাপেক্ষ। তার প্রগতি সহজে প্রত্যক্ষ করা যায় না, বংশানুক্রমে অত্যন্ত ধীরগতিতে তার প্রকাশ হয়। প্রাকৃতিক নির্বাচনের কাঠখড় জোগান দেয় প্রকারণ। ব্যক্তিগত প্রকারণগুলি খুব সামান্য

ভাবেই প্রথমে দেখা দেয়। বহুপুরুষ ধরে নির্বাচন চলতে থাকলে অল্প অল্প করে সেগুলির উৎকর্ষ হয়ে ক্রমশ স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষগোচর হয়ে ওঠে। পৃথিবীতে জীবজন্তুর বৈচিত্র্য প্রকাশ পেতে, তাদের উন্নতির দিকে অভিব্যক্তি হতে, তাই লক্ষ লক্ষ বছর লেগেছে। প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রণালীতে অভিব্যক্তি হয় খুব মন্দগতিতে কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিপর্যয় যদি হঠাৎ না ঘটে তবে তার কাজ অলক্ষ্যে চলতে থাকে অব্যাহতভাবে—কখনো তার বিরাম নেই।

এই হ'ল ডারউইনের বিবর্তবাদের সংক্ষিপ্ত সারমর্ম।

ডারউইনের পরে

ডারউইন জীববিজ্ঞান-জগতে এক নূতন যুগ এনে দিলেন। কিন্তু তাই বলে মনে করলে চলবে না যে তাঁর মতবাদ সকলে সহজে গ্রহণ করেছিল অথবা তার সমালোচনা ও প্রতিবাদ থেকে বিজ্ঞানীরা এখনো নিবৃত্ত হয়েছেন। ডারউইনের পর জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অনেক এগিয়েছে। যেসব নূতন বিষয় জানতে পেরেছি তার দ্বারা মোটের উপর বলা যায় ডারউইনের মতবাদের ভিত্তি আরো দৃঢ় হয়েছে, ডারউইন যেসব ঘটনার কারণ বোঝাতে পারেন নি এখন আমাদের কাছে তা সুবোধ্য হয়েছে।

জীবের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে ডারউইনোত্তর আলোচনার পূর্বে লামার্কের মতবাদ বিষয়ে কিছু বলে নেওয়া দরকার। অভিব্যক্তির যত মতবাদ আছে তার মধ্যে লামার্ক ও ডারউইনের মতবাদ দুটিই অগ্রণী। প্রাণীবিজ্ঞান কখনো ডারউইনের দিকে কখনো লামার্কের দিকে বেশি ঝুঁকেছে—গত শতাব্দীতে এই দুই মতবাদের মধ্যেই বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস ক্রমাগত দোদুল্যমান রয়েছে দেখতে পাওয়া যায়। অভিব্যক্তির তথ্য সম্বন্ধে দু'জনেরই মত এক, বিরোধ হচ্ছে প্রণালী নিয়ে। লামার্ক পারিপার্শ্বিকের কার্যকারিতার উপর বেশি ঝোঁক দিয়েছিলেন। তাঁর মতে, যে প্রাকৃতিক সমাবেশের মধ্যে আমরা বাস করি তার সঙ্গে যোঝবার জন্য আমাদের কোনো কোনো বিশেষ ইন্দ্রিয় বা অঙ্গের বেশি করে চর্চার দরকার হয়।

যেগুলির বেশি ব্যবহার হয় তাদের উন্নতি হতে থাকে, আর যেগুলি একেবারেই ব্যবহারে না লাগে সেগুলি ক্রমশ লোপ পায়। যে সব জন্তু গুহার মধ্যে অন্ধকারে থাকে তারা দৃষ্টিশক্তি হারায়। হরিণকে বাঘের আক্রমণ থেকে পালিয়ে বাঁচতে হয় তাই তার পা লম্বা ও দৌড়বাব শক্তি বেশি। লামার্ক ধরে নিয়েছিলেন সর্বদা ব্যবহারের দ্বারা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যে উৎকর্ষ সাধিত হয় বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার গুণে যে পরিবর্তন ব্যক্তির জীবদ্দশাতেই ঘটে সেগুলি সবই কুলসঞ্চারী। স্বোপার্জিত গুণ কুলসঞ্চারী কি না—এই নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে তুমুল তর্ক চলছে সেই থেকে। লামার্কের মতবাদ এই সত্যটির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে ব'লে, বিশেষ করে এই বিষয়টাই সমস্ত তর্কের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বোপার্জিত গুণ কুলসঞ্চারী দেখিয়ে একদল বিজ্ঞানী যেমনি কয়েকটি প্রমাণ সংগ্রহ করলেন অন্যদল অবিলম্বে তার বিরুদ্ধে প্রচুর প্রমাণ উপস্থিত করলেন।

জার্মানিতে হ্বাইসম্যান-এর (Weismann ১৮৩৪-১৯১৪) আবিষ্কার লামার্কের মতবাদকে দিল কঠিন আঘাত। তিনি অনুবীক্ষণের সাহায্যে জীবকোষের মধ্যে উত্তরাধিকারের বাহন ক্রোমোসোম (Chromosome) আবিষ্কার করলেন এবং প্রমাণ করলেন, পিতামাতার ক্রোমোসোমে যে সব গুণের লক্ষণ একেবারেই নেই তাদের সন্তানদের মধ্যে সেই গুণ কিছুতেই বর্তাতে পারে না। স্বোপার্জিত গুণ ক্রোমোসোমের কোনো পরিবর্তন ঘটাতে পারে না—তাই সেগুলি কুলসঞ্চারী নয়। এদিকে লামার্কের মতবাদ যাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁরাও চুপ করে বসে ছিলেন না। তাঁরা লামার্কিজমকে নূতন আকারে পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করলেন। এঁরা নব-লামার্ক মতবাদী (Neo-Lamarckian) বলে পরিচিত।

নীতিতত্ত্ববিদেরা লামার্কের বৈজ্ঞানিক মতবাদ বেশ পছন্দ করলেন। নিজের চেষ্টায় উন্নতি সম্ভব, লামার্ক দেখিয়েছেন। হ্বাইসম্যানকে বিশ্বাস করলে সম্পূর্ণ অদৃষ্টবাদী হতে হয়, তাঁদের সেটা ভালো না লাগবারই কথা। নিজের নিজের কর্মফলে বিশ্বাস থাকলে মানুষের মনে খানিকটা আশাভরসার সঞ্চার হয়। তবু এতেও সকলকে সম্পূর্ণ তৃপ্তি দিতে পারল না। পৃথিবী গড়ে উঠল —এক কণা সেল থেকে এত গাছপালা ফুলফল তৈরি হ'ল, মূঢ় মূক জানোয়ার থেকে সূক্ষ্মবুদ্ধি মানুষ জন্মাল —একি কেবল প্রাকৃতিক নির্বাচনের মত অন্ধ নিয়মের কাজ ? এর ভিতর কি কোনো আধ্যাত্মিক শক্তি নেই ? অনেকে মনে করলেন তা হতেই পারে না। তাই প্রাণবাদী বা অধ্যাত্মবাদী (Vitalist) বলে একটি দলের সৃষ্টি হ'ল। তাঁরা ক্রমবিবর্তন বিশ্বাস করলেও দেখাতে চেষ্টা করলেন অভিব্যক্তি ধারাবাহিকভাবে কেবল উন্নতির দিকেই যে চলেছে তা কেবল প্রাকৃতিক নিয়মে সম্ভব নয়, তার পিছনে কোনো ঐশ্বরিক বা অতি প্রাকৃত জীবনীশক্তি নিশ্চয়ই কাজ করছে। এই শতাব্দীর গোড়ায় যখন বার্গসঁ তাঁর Creative Evolution বইয়ে প্রাণপ্রেতি (Elan Vital) নাম দিয়ে এক ঐ ধরনের নিগূঢ় শক্তির কথা অবতারণা করলেন অবৈজ্ঞানিক জনসমাজ খুব উল্লসিত হয়ে তাঁর কথা গ্রহণ করল। বর্নার্ড শ'-ও থেকে থেকে ডারউইনিজ্‌মের বিরুদ্ধে কটাক্ষপাত করতে ছাড়েন নি। পৃথিবীতে কেবলই প্রতিযোগিতা ও সংগ্রাম, যারা দুর্বল তাদের ইহলোকে কোনো স্থান নেই, তাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী—এই জিনিসটা বর্নার্ড শ' প্রভৃতি আদর্শবাদীদের আঘাত দেয়। ক্রপট্‌কিন (Kropotkin) প্রমাণ করতে

চেষ্টা করলেন, জীবজন্তুর মধ্যে প্রতিযোগিতার পাশাপাশি সহযোগিতাও যথেষ্ট দেখা যায়।

ডারউইন ও লামার্কের মতবাদ নিয়ে যখন তুমুল বিবাদ চলছে সেই সময় ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে মেণ্ডেল্-এর (Mendel, ১৮২২-৮৪) আবিষ্কার পুনঃপ্রকাশিত হ'ল। মেণ্ডেলিজম্‌কে যুগবিপ্লবী আবিষ্কার বলা যেতে পারে। ইতিপূর্বে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বা প্রকারণ স্বতঃপ্রতিষ্ঠিত সত্য বলে সকলকে মেনে নিতে হয়েছিল। মেণ্ডেলিয়ান-বিজ্ঞান স্পষ্ট বুঝিয়ে দিল তার অন্তর্নিহিত কার্যকারণ-শৃঙ্খলা। জীবকোষের গঠন ও তার যৌনবিভাগ প্রণালী সম্বন্ধে হ্বাইসম্যান-এর গবেষণা এই বিষয় যথেষ্ট সাহায্য করল। মেণ্ডেল প্রকারণের প্রকৃতি ও উত্তরাধিকারপ্রণালী বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, প্রকারণের উৎপত্তি ও আধার কোথায়, এবং কেন মেণ্ডেলিয়ান নিয়মে তার উত্তরাধিকার চলে হ্বাইসম্যানই তা স্পষ্ট করে দিলেন। প্রত্যেক জাতির জীবকোষে নির্দিষ্টসংখ্যক ক্রোমোসোম আছে। কোষকেন্দ্রের মধ্যে দড়ির মত পাকানো খানিকটা ঘন পদার্থ আছে। সেল যখন বিভক্ত হয় তখন সেটা আর জট পাকানো থাকে না, বিচ্ছিন্ন হয়ে কোষকেন্দ্রের দুই মেরুতে জোড়ায় জোড়ায় দাঁড়িয়ে যায়—কখনো দু'টুকরো দড়ির মত, কখনো ফুটকির মত। জীবকোষের এই পদার্থগুলির নাম দেওয়া হ'ল ক্রোমোসোম। এক-এক জাতির এক-একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা আছে, জাতিবিশেষে ক্রোমোসোমের সংখ্যার কখনো ব্যতিক্রম হয় না। মানুষের জীবকোষে ৪৮টি ক্রোমোসোম পাওয়া যায়; যে-কোনো মানুষের শরীরের যে-কোনো অংশের জীবকোষ অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখলে ঐ ৪৮টি ক্রোমোসোম তার ভিতর পাওয়া যাবে। শরীরের বৃদ্ধি হয়

জীবকোষের বিভাজন ও সংখ্যাবৃদ্ধির দ্বারা। জীবকোষের বিভাজনের অনতিপূর্বে ক্রোমোসোমগুলি তার ভিতর ডবল হয়ে যায়। ভাগের সময় তার অর্ধেকগুলি একটি বাচ্ছা সেলে ও বাকি অর্ধেক অন্যটিতে চলে যায়। বিভাজনের পূর্বে ডবল হয়ে যাওয়া ও পরে সমান দুভাগে বিভক্ত হওয়ার ফলে বাচ্ছা সেলে ক্রোমোসোমের সংখ্যা ঠিক থেকে যায়। স্ত্রী পুরুষসংগমঘটিত বিভাজনে অর্ধেক আসে পৈতৃক জননকোষ থেকে, বাকি অর্ধেক মাতৃক ডিম্বকোষ থেকে। তাই বাপ-মা দুজনের কাছ থেকে শিশু সমান উত্তরাধিকার পায়।

মেণ্ডেলিজমের মূল কথা হ'ল—জৈব-ব্যক্তিত্ব কতকগুলি গুণের সমবায়। কিন্তু গুণগুলি তার স্বোপার্জিত সম্পত্তি নয়, এগুলি তার পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পাওয়া। গুণের আধার ক্রোমোসোম। ক্রোমোসোমেরও ভাগ আছে, বহু বিন্দু সমাবেশে সেগুলি গঠিত। বংশানুক্রমের আদিম আধার ক্রোমোসোমের এই ক্ষুদ্রাংশগুলিকে 'জীন' (Gene) বলে। প্রত্যেক জীন এক একটি পৃথক 'মেণ্ডেলিয়ান' গুণ প্রকাশের জন্য দায়ী।

বংশানুক্রম ব্যাপারটাই সংখ্যা নিয়ে কারবার। তার শুরু স্ত্রী ও পুরুষ দুটির মিলন থেকে। বংশানুক্রমের নিয়ম আবিষ্কার করার জন্য মেণ্ডেল যখন জোড়া জোড়া গুণ সংমিশ্রণ করে তার ফলাফল নিরীক্ষণ করতে লাগলেন তার ভিতরও অঙ্কের হিসাব বেরিয়ে পড়ল। যে দুটি গুণ মেশানো হয় তাদের যদি ক ও খ সংজ্ঞা দেওয়া যায় তাহলে সংমিশ্রণের ফলে সন্তানদের মধ্যে এই ভাবে গুণ দুটি প্রকাশ পাবে : $ক^2+২কখ+খ^2$। এদের মধ্যে $ক^2$ ও $খ^2$-এর বংশধরেরা (নিজেদের মধ্যে যদি যৌন সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ

রাখে) বরাবর ক^{২} ও খ^{২} থেকে যাবে ; কিন্তু ক-খ-দের পরস্পর মিলনের ফলে পুনরায় ক^{২}+২কখ+খ^{২} অনুসারে সন্তান জন্মাবে। ক^{২} বা খ^{২} লেখার অর্থ, জনক ও জননী উভয়ের কাছ থেকেই এরা ক-গুণ বা খ-গুণ পেয়েছে। কাজেই তাদের মধ্যে এই গুণ দুই মাত্রায় বর্তমান ।

মেণ্ডেলের মতে মিশ্রণবিমুখ গুণমাত্রেরই কুলসঞ্চার উপরোক্ত নিয়মে হয় । এর থেকে ব্যক্তিগত প্রকারভেদের মূল কারণ বেশ বোঝা যায় । দেখা যায়, প্রকারণ আকস্মিক ভাবে হয় না, নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে হয়। মেণ্ডেল নানাবিধ কড়াইশুঁটির গাছ নিয়ে পরীক্ষা করে সেই নিয়ম আবিষ্কার করেছিলেন আর হ্বাইসম্যান কেন ঐ নিয়মে উত্তরাধিকার চলে তা বোঝাবার সুবিধা করে দিয়েছেন।

মেণ্ডেলিয়ান বংশানুক্রমের নিয়ম যখন প্রথম জানা গেল তখন অনেকের মনে হয়েছিল ডারউইনিজ্‌ম্‌-এর এবার পতন হ'ল। ডারউইনের মতে, নতুন কোনো গুণ প্রথমে খুব সামান্যভাবে প্রকাশ পায়, বহুকাল ধরে প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলে অল্প অল্প করে তার উৎকর্ষ হতে থাকে। অভিব্যক্তির প্রগতি ধীর এবং ধারাবাহিক। মেণ্ডেলিয়ান উত্তরাধিকারের মধ্যে কিন্তু ধারাবাহিকতা নেই। দুই পৃথক জন্মদাতার মিলনে সন্তান জন্মে। তাদের গুণ-গুলি সন্তানের মধ্যে মিশ্রিত হয় না, প্রত্যেক গুণের স্বাধীন সত্তা বজায় থাকে, বংশানুক্রমে তার পরিবর্তন বা সংমিশ্রণ হয় না। কাজেই অভিব্যক্তি কোনো ধারানুযায়ী সমভাবে হতে পারে না, বিচ্ছিন্ন-ভাবে এক-এক লম্ফে এগিয়ে চলে। এই মতের সপক্ষে ম্যুটেশন (mutation) ব্যাপারটা ভালো সাক্ষ্য দিল। দ্য ভ্রিজ (De Vries) ও বেটসন্ (Bateson) মেণ্ডেলিয়ান উত্তরাধিকার সম্বন্ধে পরীক্ষা করতে গিয়ে

দেখলেন—নানাবিধ গুণ সংমিশ্রণের ফলে কদাচিৎ নিয়মবহির্ভূত অভিনব রূপের আবির্ভাব হয়। বংশের কোনো একটি সন্তানের মধ্যে হঠাৎ এমন একটি নূতন গুণ প্রকাশ পায় পূর্ব-বংশাবলীতে যার কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় না। এই ঘটনাটিকে তাঁরা ম্যুটেশন নাম দিলেন। একহারা (single)-পাপড়ি ডালিয়া-বংশে যদি কোনো একটি গাছ জন্মায় যাতে হঠাৎ ডবল-পাপড়ি ফুল ধরতে দেখা যায়, তবে তাকে ম্যুটেশন বলব। ডারউইন এই ঘটনা একেবারে যে জানতেন না, তা নয়। তিনি এই ব্যাপারকে স্পোর্ট (sport) বা প্রকৃতির খেয়াল বলে অবজ্ঞা করেছিলেন, তাঁর যুক্তিতর্কের মধ্যে ম্যুটেশন কোনো স্থান পায় নি। ম্যুটেশনের এখন প্রাধান্য বেড়ে গেল, দ্য ভ্রিজ ও বেটসন প্রমাণ করতে চেষ্টা করলেন বড় রকম উন্নতি সবই ম্যুটেশন থেকে হয়; ম্যুটেশন প্রথম খোরাক জোটায় তারপর প্রাকৃতিক নির্বাচনের কাজ হচ্ছে এইরকম আকস্মিক উন্নতি অবলম্বন করে তাকে অল্পবিস্তর পরিবর্তন বা সংস্কার করে স্থায়ী করে দেওয়া। তাঁদের মতে অভিব্যক্তি নির্দিষ্ট এক-একটি পথ ধরে ধারাবাহিক ভাবে হয় না, বিচিত্র পথে বিচ্ছিন্নভাবে বড়ো বড়ো ধাপ ডিঙিয়ে এগিয়ে চলে। মেণ্ডেলের আবিষ্কার ডারউইনিজ্‌মকে আর-একবার প্রচণ্ড আঘাত দিল।

দ্য ভ্রিজের পর অনেক বছর কেটেছে। এর মধ্যে মেণ্ডেলিয়ান বংশানুক্রম প্রণালী সম্বন্ধে আমরা আরো অনেক বেশি জেনেছি। জেনেটিকস্ (Genetics) নামে জীববিজ্ঞানের একটি নূতন শাখাই প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল। এই বিষয়ে যতই গবেষণা হচ্ছে ও আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি পাচ্ছে বিজ্ঞানীদের অভিমত আবার ডারউইনের দিকে ঘুরে আসছে।

জেনেটিকস্ বিজ্ঞানের gene নিয়ে কারবার। "জীন" বলতে কী বোঝায় পূর্বেই কিছু বলেছি। মেণ্ডেলিয়ানদের মতে প্রত্যেক জীব, প্রত্যেক ব্যক্তি কতকগুলি গুণের আধার। প্রত্যেক গুণ প্রকাশের জন্য ক্রোমোসোমের বিশেষ অংশ দায়ী। সেই অংশকে "জীন" বলা হয়। বহু জীন নিয়ে একটি ক্রোমোসোম গঠিত। ক্রোমোসোমের সংখ্যা খুব বেশি নয়, জাতিবিশেষে এক থেকে কয়েক শত পর্যন্ত থাকতে দেখা যায়। প্রত্যেক ক্রোমোসোমে অনেক জীন থাকে। কোনো কোনো ড্রোসোফিলা (Drosophila) মাছির জীবকোষে ১৩,০০০এর অধিক জীন আছে অনুমানিত হয়েছে। জীন মাপাও গেছে, এক একটি জীনের মাপ ১০টি প্রোটিন পরমাণুর কাছাকাছি। জীবকোষের বিভাজনের সময় জীনগুলির কোনো পরিবর্তন হয় না, অর্থাৎ বংশপরম্পরায় তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কখনো নষ্ট হয় না। তবে সঙ্গগুণে জীনের পরিবর্তন হওয়া বিচিত্র নয়। দেখা গেছে কোনো কোনো জীন প্রতিবেশী জীনের প্রকৃতির কিছু পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছে। নিশ্চিতভাবে এখন বলা যায় জীন-ঘটিত পরিবর্তন ব্যতীত জীবের কোনো পরিবর্তন সম্ভব নয়।

ব্যষ্টিগত প্রকারণ দুই উপায়ে হতে পারে--

(১) জীনবিশেষের গঠনমূলক পরিবর্তনের ফলে।

(২) জীবকোষ-বিভাজনের সময় সন্তানকোষে জীনের বিন্যাস তারতম্যে।

প্রথম কারণ থেকে ম্যুটেশন, দ্বিতীয় কারণ থেকে সাধারণ প্রকারভেদের উৎপত্তি। দেখা গেছে ম্যুটেশন কৃত্রিম উপায়ে ঘটানো সম্ভব। দুএকটি ওষুধ এবং একস্-রে রশ্মির প্রয়োগে আশ্চর্যরকম ফল পাওয়া গেছে। বৈজ্ঞানিক ল্যাবরেটরিতেই

গাছপালার অভিনব রূপের সৃষ্টি হচ্ছে। স্বাভাবিক অবস্থায় প্রকৃতিতে অনবরত ম্যুটেশন হয় নিঃসন্দেহ। দ্য ভ্রিজ তাই দেখেই চট্ করে অনুমান করে ফেলেছিলেন ম্যুটেশনের সাহায্যেই অভিব্যক্তি হয়। কিন্তু আসলে ঠিক তা নয়। ম্যুটেশন হয়েই নূতনের সৃষ্টি হয় সত্য কিন্তু সেটা স্থায়ী হয় না। প্রকৃতির রাজ্যে ম্যুটেশন যত বড় রকমের হয়, নূতনত্ব যত বেশি করে প্রকাশ পায় ততই শীঘ্র সেটা লোপ পেয়ে যায়। বড় বড় ম্যুটেশন ক্রমোন্নতির কাজে সেইজন্য বেশি সাহায্য করে না। তাহলে দেখা যাচ্ছে অভিব্যক্তি ধীর ও ধারাবাহিক গতিতেই চলে। ছোটখাটো ম্যুটেশনগুলিই অভিব্যক্তির প্রকৃত সাহায্য করে।

গত কয়েক বছরের মধ্যে জেনেটিক্স্ আমাদের যে সব নতুন খবর দিতে পেরেছে তদনুসারে ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদকে নতুন ভাষায় নতুন রূপে ব্যক্ত করা যেতে পারে—

অভিব্যক্তির উপাদান

(১) ব্যক্তিগত ম্যুটেশন অভিব্যক্তির প্রথম খোরাক জোগায়। বড় রকমের ম্যুটেশন বেশিদিন স্থায়ী হয় না কেন না অধিকাংশ সময় সেগুলি প্রতিযোগিতার সহায়ক নয়। অল্পস্বল্প ম্যুটেশনগুলিই প্রাকৃতিক নির্বাচনের সহায়ক।

(২) জীনের আমূল কোনো পরিবর্তন না হয়ে তাদের সমষ্টি-গত বৈচিত্র্যের ফলে ব্যক্তিগত প্রকারণ—অভিব্যক্তির আর একটি খোরাক। এক্ষেত্রে নতুন কিছু আমদানি হ'ল না, যা ছিল তাই একটু বদল করে সাজিয়ে দেওয়া হ'ল। ধারাবাহিক

ভাবে যুগ যুগ ধরে যে অভিব্যক্তি চলতে থাকে তারই মালমশলা হ'ল ব্যক্তিগত প্রকারণগুলি ।

অভিব্যক্তির প্রণালী

(১) উপরোক্ত যে-কোনো রকম পরিবর্তন উপস্থিত হ'লেই তাকে নানান প্রাকৃতিক নিয়মের কলে ফেলে পারিপার্শ্বিকের উপযোগী করে নেবার চেষ্টা চলে। এই কঠিন পরীক্ষা যে অতিক্রম করতে না পারে তাকে বিদায় নিতে হয়, অভিব্যক্তির দ্বিতীয় ধাপে তাকে আর উঠতে হয় না।

(২) আরম্ভে প্রকৃতি আনলেন ইমারত প্রস্তুতের জন্য কতকগুলি মালমশলা। সেগুলিকে প্রয়োজনমত অদলবদলের দ্বারা ব্যবহার-যোগ্য করে নিয়ে তৈরী হ'ল ইমারত। এখন সে-ইমারত খসে না পড়ে তার চেষ্টার দরকার। যে প্রকারণগুলি এতদিনে জীবনসংগ্রামের উপযোগী বলে প্রতিপন্ন হয়েছে সেগুলি যাতে স্থায়ী হয় প্রকৃতিতে তারই নানান চেষ্টা চলে।

উপরোক্ত উভয় কাজেতেই প্রধানত সাহায্য করে প্রাকৃতিক নির্বাচন।

অবশেষে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে। অভিব্যক্তিবাদীরা ক্রমাগত ক্রমোন্নতির কথা বলেন, কিন্তু উন্নতি কাকে বলব? উন্নতি কি অবনতি বিচার করবে কে? একটি অ্যামিবা বা একটি মৌমাছি তার নিজের পরিবেশের মধ্যে স্বাধীন জীবন যাপন করার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। এমন কি হাতি, ঘোড়া, মানুষ প্রভৃতি যাদের আমরা

উচ্চশ্রেণীর জীব বলি তাদের অপেক্ষা এই নিম্নশ্রেণীর জীবেরা সম্ভবত জীবনসংগ্রামে উদ্বর্তনের বেশি যোগ্য। হলডেন (Haldane) সেইজন্য সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, আমরা 'উচ্চ' 'নিম্ন' বলে যে সংজ্ঞা ব্যবহার করে থাকি তা হয়তো মানুষের অহংকার-প্রসূত। ব্যাকটিরিয়া কোটি কোটি বছর বেঁচে আছে, মানুষ কয়েক লক্ষ বছর মাত্র বেঁচে আছে। এই দু'জাতের মধ্যে তাহলে কাকে যোগ্যতর বলব ? আগে বিচার করতে হয়, উন্নতি বলতে কি বোঝায়। জুলিয়ান হাক্‌স্‌লি (Julian Huxley) বলেন, কেবল দু-একটি বিষয়ে বিশেষ উৎকর্ষ ও সর্বাঙ্গীণ উন্নতি—এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বা বিশেষ কোনো পরিবেশের উপযোগী হবার জন্য একদিক-ঘেঁসা কার্যকারিতাকে উন্নতি বলব না। উন্নতি তাকেই বলব যার ভিত যেমন গভীর তেমনি ব্যাপক। তার পরিচয় কোনো নির্দিষ্ট কাল বা অবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এই অর্থে তারাই উন্নত জীব যারা আপন আপন পরিবেশের দাস নয়—যারা প্রকৃতিকে আয়ত্ত করে বা পরাভূত করে স্বাধীন হতে পেরেছে। জীবের ক্রমোন্নতি নানান দিকে এগিয়েছে। একটিমাত্র জীবকোষ রূপে তার জন্ম, তার থেকে বহুকোষী হ'ল। তার পর কোনো এক সময় মস্তক দেখা দিল; আর এক সময় শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়ার জন্য ফুসফুস গড়ে উঠল; তারপর উষ্ণ রক্ত প্রবাহের ব্যবস্থা ও সবশেষে বাক্‌শক্তি ও বুদ্ধির অভিব্যক্তি হ'ল। এই সমস্তই উচ্চ-শ্রেণীর জীবদের কেবল যে নিজের পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনের যোগ্য করেছে তা নয়, সেই পরিবেশের বন্ধন থেকে তাদের অনেকখানি মুক্তি দিয়েছে।

তারপর কথা হচ্ছে, উন্নতি একবার আরম্ভ হলে কি চলতেই থাকে? জীবশ্রেণীমাত্রই কি ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে; তা নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিব্যক্তি এমন জায়গায় পৌঁছে দেয় যেখানে এগোবার আর পথ নেই। ক্রমোন্নতি এক জায়গায় এসে হঠাৎ থেমে যায়। কীটপতঙ্গদের ঠিক এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে। পিঁপড়ে, মৌমাছি প্রভৃতি বহু যুগ ধরে একই ভাবে থেকে গেছে, তাদের কোনো পরিবর্তন হয় নি, উন্নতিও হয় নি। পাখিরা মিয়োসিন যুগেই অভিব্যক্তির শেষপর্যায়ে পৌঁছে গেছে, স্তন্যপায়ী জন্তুরা প্লিয়োসিন যুগের পর আর অগ্রসর হয় নি বললেই হয়। কেবল মানুষই একমাত্র জীব যে অভিব্যক্তির পথে আশ্চর্যরকম দ্রুত এগিয়েছে এবং যার সামনে উন্নতির পথ আজও সম্পূর্ণ অবারিত। পৃথিবী থেকে মানুষ লোপ পেলে আর কোনো জন্তু নেই যে মানুষের স্থান অধিকার করতে পারে। একমাত্র মানুষের বেলায় বলা চলে তার চিন্তা স্থূলবস্তুর রাজ্য অতিক্রম করে সূক্ষ্ম ভাবরাজ্যে গিয়ে পৌঁচেছে। মানুষের বুদ্ধির কাছে প্রকৃতি বশীভূত, মানুষ ইচ্ছামত স্বভাবের নিয়ম লঙ্ঘন করতে পারে। মানুষের শক্তি সবরকম প্রাকৃতিক বাধা অতিক্রম করে যে প্রচণ্ডবেগে অগ্রসর হচ্ছে, তাতে ভয়েরও কারণ দেখা দিচ্চে— মানুষ এই শক্তি নিজের উন্নতির জন্য প্রয়োগ না করে নিজেরই ক্ষতি করবার চেষ্টা করতে পারে। যে মননশক্তিকে মানুষ আত্মবিকাশে নিযুক্ত করে জীবনসংগ্রামে জয়ী হয়ে এসেছে, সেই শক্তি যদি বিবেকহীন যথেচ্ছাচারে পরিণত হয় তাহলে শোচনীয় আত্মঘাত থেকে কেউ মানুষকে রক্ষা করতে পারবে না।

মানুষের মননশক্তির সবচেয়ে বড় দান হ'ল, বিবেক বা

বিচারবুদ্ধি হিংসা, দ্বেষ, অহংকার প্রভৃতি যে হেয় গুণ স্বার্থ-প্রভাবে মানবজীবনে প্রাধান্য লাভ করেছে, স্নেহ-প্রেম-দয়া-মৈত্রী প্রভৃতি মানবের উন্নততর শ্রেয়বৃত্তির হাতে তাদের পরাভব ঘটাবার দায়িত্ব মানুষ যদি আজ দৃঢ় সংকল্প হয়ে গ্রহণ না করে তাহলে মানবজাতির সমূলে বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। সৃষ্টির বর্তমান পর্যায়ে অভিব্যক্তির ভার ন্যস্ত হয়েছে মানুষের উপর। সে যদি তার শুভবুদ্ধি প্রয়োগ করে নিজের উন্নতির পথ প্রশস্ত করতে পারে, তাহলে মানুষের ভিতর দিয়েই আদিম প্রাণশক্তি বহুবিচিত্র সম্ভাবনার দিকে ক্রমশই এগিয়ে যাবে—প্রকৃত উন্নতির এই একমাত্র পথ এখনো খোলা আছে।

॥ ১৩৫০ ॥

১. সাহিত্যের স্বরূপ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২. কুটিরশিল্প : শ্রীরাজশেখর বসু
৩. ভারতের সংস্কৃতি : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৪. বাংলার ব্রত : শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৫. জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৬. মায়াবাদ : মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ
৭. ভারতের খনিজ : শ্রীরাজশেখর বসু
৮. বিশ্বের উপাদান : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৯. হিন্দু রসায়নী বিদ্যা : আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়
১০. নক্ষত্র-পরিচয় : অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
১১. শারীরবৃত্ত : ডক্টর রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
১২. প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী : ডক্টর সুকুমার সেন
১৩. বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ : অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়
১৪ আয়ুর্বেদ-পরিচয় : মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন
১৫. বঙ্গীয় নাট্যশালা : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৬. রঞ্জন-দ্রব্য : ডক্টর দুঃখহরণ চক্রবর্তী
১৭. জমি ও চাষ : ডক্টর সত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী
১৮. যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি-শিল্প : ডক্টর মুহম্মদ কুদরত-এ-খুদা

॥ ১৩৫১ ॥

১৯. রায়তের কথা : শ্রীপ্রমথ চৌধুরী
২০. জমির মালিক : শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত
২১. বাংলার চাষী : শ্রীশান্তিপ্রিয় বসু
২২. বাংলার রায়ত ও জমিদার : ডক্টর শচীন সেন
২৩. আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা : অধ্যাপক শ্রীঅনাথনাথ বসু
২৪. দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি : শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
২৫. বেদান্ত-দর্শন : ডক্টর রমা চৌধুরী
২৬. যোগ-পরিচয় : ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার
২৭. রসায়নের ব্যবহার : ডক্টর সর্বাণীসহায় গুহ সরকার
২৮. রমনের আবিষ্কার : ডক্টর জগন্নাথ গুপ্ত
২৯. ভারতের বনজ : শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু
৩০. ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস : রমেশচন্দ্র দত্ত
৩১. ধনবিজ্ঞান : অধ্যাপক শ্রীভবতোষ দত্ত
৩২. শিল্পকথা : শ্রীনন্দলাল বসু
৩৩. বাংলা সাময়িক সাহিত্য : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৪. মেগাস্থেনীসের ভারত-বিবরণ : রজনীকান্ত গুহ
৩৫. বেতার : ডক্টর সতীশরঞ্জন খাস্তগীর
৩৬. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য : শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ